অলৌকিক প্রেম

কাসেম বিন আবুবাকার

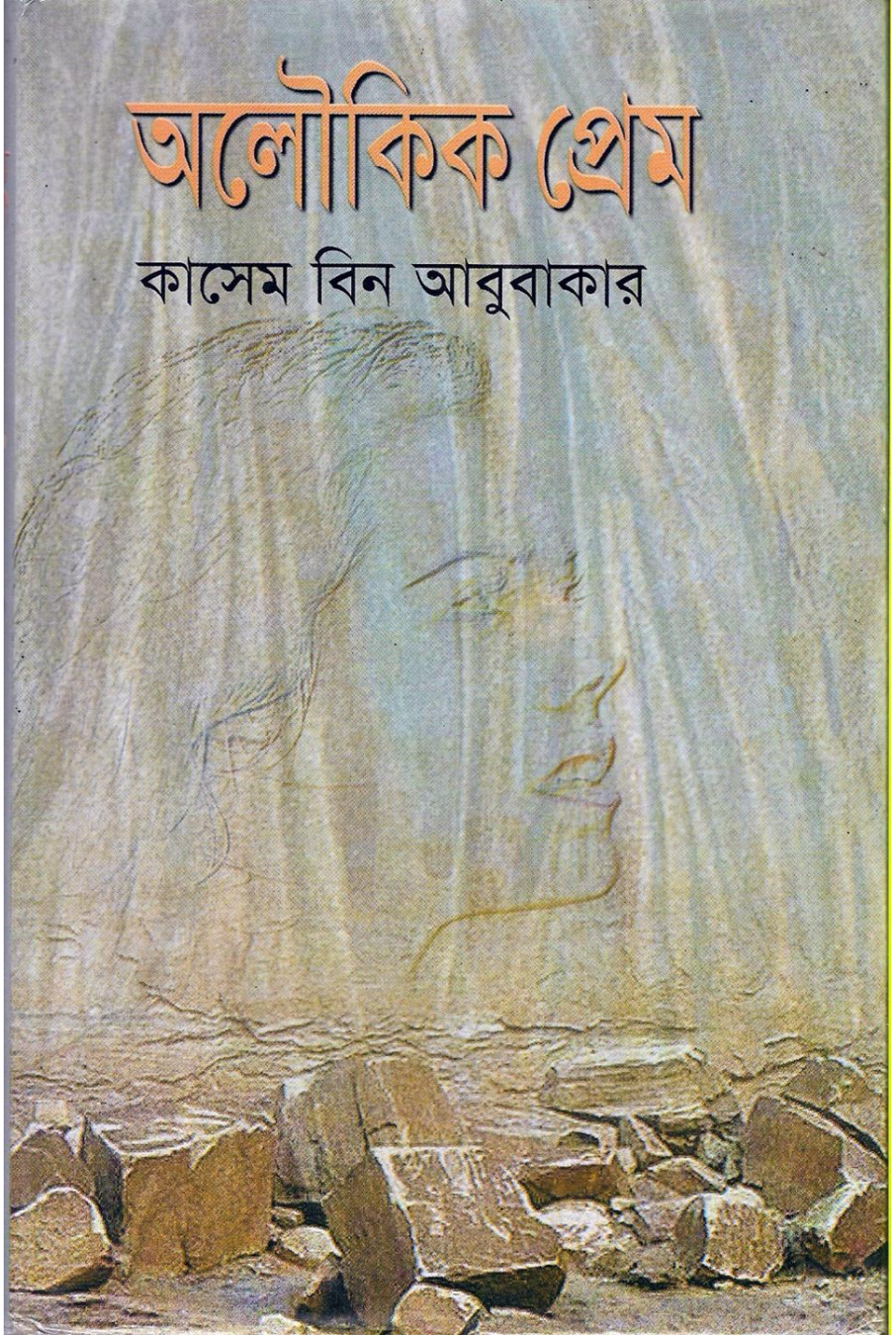

(১) "হে রসুল (দঃ) তোমার প্রভু বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াবান, যদি তিনি তাহাদের কার্যকলাপ অনুসারে ধরপাকড় করিতেন, তাহা হইলে পদে পদে তাহাদের উপর আযাব নাযিল হইত।"

আল-কুরআন-সূরা কাহাফ, আয়াত-৫৮, পারা-১৫

(২) এক ব্যক্তি রসুল (দঃ) কে জিজ্ঞাসা করিল, "মুসলমানদের মধ্যে উত্তম কে? তিনি বলিলেন, ঐ ব্যক্তি যার রসনা ও হস্ত হইতে অন্যান্য মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে।"

বুখারী ও মুসলিম

(৩) "নারী এবং পুরুষ গাড়ির দুইটি চাকার ন্যায়, চাকা যদি স্ব স্ব স্থানে না থাকে, তবে বিপর্যয় অনিবার্য।"

-ইমাম যমখশরী (রঃ)

ভূমিকা

"আল্লাহ'র নামে শুরু করছি, যিনি পরম দাতা ও দয়ালু।"

এই উপন্যাসখানা এমন একটি লৌকিক ও অলৌকিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত যা আমি পশ্চিম বাংলায় ছাত্র জীবনে মুরুব্বিদের মুখে শুনেছিলাম। এটা পাঠকবর্গের কাছে বাস্তব ও অবাস্তব দু'টোই মনে হতে পারে। লেখকরা সাধারণত সমাজের কোনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে উপন্যাস লিখলেও কেন্দ্রবিন্দুর নাম-ধাম সঠিক দেন না। আমিও তাই করি এবং এটাতে তার ব্যতিক্রম হয়নি। পাঠকদের মধ্যে অনেকে ঘটনার সত্যতা যাচাই করার জন্য কথিত নাম-ধাম খোঁজ করেন এবং বিফল হয়ে আমার প্রতি নানারকম বিরূপ মন্তব্য করেন। পাঠকবর্গ যেন ভবিষ্যতে এরকম ভুল আর না করেন, সে জন্য অনুরোধ করছি, তারা যেন কোনো কাহিনী পড়ে ঘটনার সত্যতা যাচাই করার চেষ্টা না করেন।

এই উপন্যাসের নায়ক মানুষ হলেও নায়িকা পরী। তবে নায়িকা সত্যি সত্যি পরী কিনা এবং পরীর সঙ্গে মানুষের বিয়ে হয় কিনা, তা আমি জানি না। এই কাহিনী লেখার আগে অনেকের কাছে প্রশ্নটা রেখেছিলাম; কিন্তু সঠিক উত্তর কেউ দিতে পারেনি। এবার পাঠকবর্গ কাহিনীটা পড়ে সত্য মিথ্যা বিচার করবেন।

আশা করি, মানুষ ও পরীর প্রেম কাহিনী আপনাদের কাছে সুখপাঠ্য হবে।

ওয়াস সালাম
লেখক

৭ই ফাল্গুন ১৪০০ বাংলা
৭ইং রমযান ১৪১৪ হিজরী
১৯শে ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪ ইং

পাঠক বর্গের প্রতি

পূর্বে প্রকাশিত প্রকাশকের সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় এবারে বইটির পঞ্চম সংস্করণ **'খাঁন পাবলিশার্স'** থেকে প্রকাশ করা হল। বিগত সংস্করণগুলোতে বানান, শাব্দিক ও ভাষাগত ভুল-ত্রুটি প্রচুর ছিল। এই সংস্করণে সবকিছু সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে উন্নত মানে ও নতুন আঙ্গিকে প্রকাশিত হল।

আশা করি, পাঠকবর্গ সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করবেন।

ওয়াস সালাম

১২ই মাঘ ১৪১২ বাংলা
২৪শে জিলহজ ১৪২৬ হিজরী
২৫শে জানুয়ারি ২০০৬ইং

এই লেখকের প্রকাশিত অন্যান্য বই ঃ

❐ ফুটন্ত গোলাপ ❐ ক্রন্দসী প্রিয়া ❐ জ্যোৎস্না রাতে কালো মেঘ ❐ বিলম্বিত বাসর ❐ শ্রেয়সী ❐ অচেনা পথিক ❐ বিদেশী মেম ❐ কি পেলাম ❐ প্রেমের পরশ ❐ শরীফা ❐ প্রেম স্নেহেশতের ফল ❐ স্বনির্বাচিত শ্রেষ্ঠ উপন্যাস ❐ জোঁকা (কিশোর গল্প) ❐ প্রতীক্ষা ❐ অসম প্রেম ❐ অবশেষে মিলন ❐ একটি ভ্রমর পাঁচটি ফুল ❐ পাহাড়ী ললনা ❐ অনন্ত প্রেম ❐ শেষ উপহার ❐ কলঙ্কের ফুল ❐ শহরের মেয়ে ❐ তুমি সুন্দর ❐ বিয়ে বিভ্রাট ❐ মনের মতো মন ❐ রাগ অনুরাগ ❐ শ্রাবণী ❐ জোনাকির আলো ❐ আগুনের মানব ❐ যেখানে কেউ নেই ❐ মেঘের কোলে রোদ ❐ বিকেলে ভোরের ফুল ❐ কালো মেয়ে ❐ পলাতকা ❐ শ্রেষ্ঠ প্রেমের উপন্যাস ❐ বিয়ের খোঁপা (ছোট গল্প) ❐ কামিনী কাঞ্চন ❐ প্রেম ও স্বপ্ন ❐ তোমার প্রত্যাশায় ❐ হৃদয়ে আঁকা ছবি ❐ ভাঙ্গা গড়া ❐ কে ডাকে তোমায় ❐ মেঘলা আকাশ ❐ স্বর্ণ তুমি ❐ বধূয়া ❐ বহুরূপিনী ❐ হৃদয় যমুনা ❐ ভালবাসার নিমন্ত্রণ ❐ বড় আপা ❐ আমি তোমার ❐ প্রেমের ফসল (ছোট গল্প) ❐ বড় কে (কিশোর গল্প) ❐ প্রতিবেশীনি ❐ পল্লীবালা ❐ আধুনিকা ❐ ধনীর দুলালী ❐ হঠাৎ দেখা ❐ কেউ ভোলে কেউ ভোলে না ❐ প্রেম যেন এক সোনার হরিণ ❐ পথে পরিচয় ❐ ধূমায়িত পথ ❐ যেতে নাহি দেব ❐ অমর প্রেম ❐ বিদায় বেলায় ❐ বাসর রাত ❐ বালিকার অভিমান ❐ অবাঞ্ছিত উইল ❐ চেনা মেয়ে ❐ সংসার ❐ কাঙ্খিত জীবন ❐ অলৌকিক প্রেম ❐ মানুষ অমানুষ ❐ ভালোবাসি তোমাকেই ❐ প্রেম ❐ সে কোন বনের হরিণ ❐ ফুলের কাঁটা ❐ সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে ❐ আমিও মানুষ ❐ তুমিও মানুষ ❐ নাফ নদীর বাঁকে (যন্ত্রস্থ) ❐ অপরিচিতা ❐ ফেরারি প্রেমিকা ❐ স্বপ্নে দেখা সেই মেয়েটি ❐ জীবন বড় সুন্দর ❐ সোনালি প্রভাত ❐ ঝরা পাতা ❐

জাকির মসজিদ পুকুর পাড়ের বড় নিমগাছে উঠে দাঁত মাজার জন্য একটা সরু ডাল ভেঙ্গে নেমে এল। তারপর ডালটা ভেঙ্গে দাঁতনের সাইজ করে ধোয়ার জন্য ঘাটে নামল।

সেখানে তিন চারজন মুরুব্বিলোক ছিলেন। তাদের মধ্যে একজন বলেলেন, কি সাংঘাতিক ছেলেরে বাবা! বড়রা যে গাছে উঠতে সাহস পায় না, সেই গাছে কিনা এই বাচ্চা ছেলেটা কত সহজে উঠে দাঁতন ভেঙ্গে নেমে এল?

অন্য একজন বললেন, ছেলে নয় যেন পিলে। তারপর জাকিরকে ঘাট থেকে উঠে আসতে দেখে তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, এই ছেলে, কে তুমি?

জাকির তখন নিমডালটা চিবাচ্ছিল। থু করে দাঁতনের ছিলকা ফেলে বলল, আমি জাকির, গোফরান আমার দুলাভাই।

তৃতীয় জন বললেন, তাই নাকি? তোমাদের বাড়ি তা হলে এনায়েতপুর?

জাকির বলল, জি।

তিনি আবার বললেন, তোমার তো সাহস কম না, এত মোটা গাছে উঠলে? পা ফসকে পড়ে গেলে কি হত?

জাকির বলল, পড়ব কেন? আর পড়লেই বা কি? অমন কতবার কত গাছ থেকে পড়ে গেছি। আমি ওসব কেয়ার করি না। যখন দেখব পড়ে যাচ্ছি তখন লাফ দিয়ে ডিগবাজি খেয়ে নেমে পড়ব।

তার কথা শুনে উনি সঙ্গীদের বললেন, খুব ধুরন্ধর ছেলে।

জাকির তাদের কথা গ্রাহ্য না করে দাঁত মাজতে মাজতে মাঠের দিকে যেতে লাগল।

মসজিদ থেকে কিছুটা দূরে মক্তব। মক্তবের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখল, অনেক ছেলেমেয়ে দুলে দুলে কায়দা আমপারা পড়ছে। কেউ কেউ ক্বুরআন পড়ছে। আর একজন মৌলবী বেত নাচিয়ে বলছেন, যার সবক ইয়াদ হয়েছে সে সবক দিয়ে যাও। হঠাৎ জাকিরের নজর পড়ল, কালো বোরখাপরা একটা মেয়ে মৌলবীর পাশে বসে পড়ছে। অথচ অন্যান্য সব ছেলেমেয়েরা দূরে আলাদা আলাদা লাইন দিয়ে বসেছে। মেয়েটাকে ছোট বলেই তার মনে হল। কিন্তু সে এমনভাবে বোরাখা পরেছে যে, শুধু তার দুটো চোখ দেখা যাচ্ছে। ছোট মেয়েকে বোরখা পরতে দেখে বেশ অবাক হল। ভাবল, যেসব বড় মেয়েদের বিয়ে হয়ে যায়, তারা বোরখা পরে। তা হলে কি

এত ছোট মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে? দাঁত মাজতে মাজতে কিছুক্ষণ মেয়েটার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর ফিরে এসে মসজিদ পুকুরঘাটে মুখ ধুয়ে বুবুদের ঘরে এল।

সিরাজগঞ্জ টাউনের প্রায় চৌদ্দ পনের মাইল দক্ষিণে এনায়েতপুর গ্রাম। গ্রামের পুব দিকে যুমনা নদী। এই গ্রামে শাহ্ সুফি ওয়াজেদ আলি (রঃ)-এর দরবার শরীফ আছে। উনি এই গ্রামেরই কৃতী সন্তান। অবিভক্ত ভারতের সময়কার একজন উচ্চশ্রেণীর পীর ছিলেন। বাংলা, বিহার ও আসামের অসংখ্য মুসলমানকে গোমরাহী থেকে রক্ষা করেন। ওঁনার ওয়াজ নসিহতের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ হেদায়েত প্রাপ্ত হয়। উনি এনায়েতপুরী (রঃ) নামে খ্যাত।

এই গ্রামে রহিম উদ্দিন খাঁন একজন সাধারণ গৃহস্থ। জমি জায়গা যা আছে তাতে চাষবাস করে টেনেটুনে কোনোরকমে সংসার চালান। ছেলেমেয়েদেরকে লেখাপড়া করাবার খুব ইচ্ছা। তাই শত অভাবের মধ্যেও তাদেরকে লেখাপড়া করাচ্ছেন। ওনার দুই ছেলে ও এক মেয়ে। মেয়েটা বড়। নাম সুফিয়া। ছেলে দু'টোর বড়টার নাম খলিল, আর ছোটটার নাম জাকির। সুফিয়া যখন ক্লাস নাইনে পড়ে তখন ভালো সম্বন্ধ পেয়ে বিয়ে দিয়ে দেন। মেয়ের বিয়ের দেয়ার এক বছর পর রহিম উদ্দিন মারা যান। তখন খলিল ক্লাস এইটে আর জাকির ফাইভে পড়ে। আব্বা মারা যাওয়ার পর খলিল ক্লাস নাইনে উঠে পড়াশোনা বন্ধ করে সংসারের কাজ কর্ম করতে লাগল। রহিম উদ্দিনের স্ত্রী দিলারা খানক খুব ধার্মিক ও কর্মঠ মহিলা। স্বামী মারা যাওয়ার পর খলিলের সাহায্যে সংসার চালিয়ে যেতে লাগলেন। বছর দুই পর দিলারা বেগম একবার কঠিন অসুখ হয়ে অনেক দিন বিছানায় পড়েছিলেন। সেই সময় নিজের সেবা যত্নের ও সংসারের কাজ কর্মের জন্য তিনি নিজের ভাইয়ের সাহায্যে তারই শালার মেয়েকে খলিলের বৌ করে ঘরে আনেন। খলিল অভাবের জন্য লেখাপড়া বন্ধ করলেও ছোট ভাই জাকিরের লেখাপড়ার দিকে খুব লক্ষ্য রাখল। তার ইচ্ছা জাকিরকে লেখাপড়া করিয়ে অনেক বড় করবে। রহিম উদ্দিন নিজে যেমন ধর্ম কর্ম মেনে চলতেন তেমিন স্ত্রী ও ছেলে মেয়েদেরকে সেইভাবে চালাতেন। সুফিয়া ও খলিল বাপের শিক্ষা মেনে চললেও জাকির সেসব মেনে চলত না। সে একটু ডানপিটে। ছেলেবেলা থেকে পাড়ার ছেলেদের সাথে ঝগড়া মারামারি করত। সাথীদের নিয়ে পাড়ার লোকদের ডাব চুরি করে খেত। রহিম উদ্দিন ছেলেকে খুব শাসন করতেন। কিন্তু তাতে কিছু ফল হয়নি। জাকির যত বড় হলে লাগল তত তার দুষ্টুমী বাড়তে লাগল। ছেলের জন্য রহিম উদ্দিনকে অনেক সময় বিচারে অপমানিত হতে হয়েছে। তিনি মারা যাওয়ার পর জাকির আরও বেপরওয়া হয়েছে। পাড়ার সমবয়সী ছেলেদের সে সর্দার। তাকে সবাই ভয় পায়। ভয় ডর কি জিনিস জানে না। গ্রামের লোকেরা বলাবলি করে, রহিম উদ্দিন কত ভালো লোক ছিল, ছোট ছেলেটা তার নাম ডুবাবে। খলিল ছোট ভাইয়ের স্বভাব-চরিত্র নিয়ে খুব চিন্তিত। দিলারা খানম জাকিরকে প্রথম দিকে অনেক বুঝিয়েছেন, তাতে কাজ না হতে ভীষণ রাগারাগিও করেছেন; কিন্তু সেসব গ্রাহ্য করেনি। তবে তার একটা বড় গুণ, সে পড়াশুনায় খুব ভালো। প্রত্যেক বছর স্ট্যাণ্ড করে।

এখন জাকির ক্লাস এইটে পড়ে। বড় বোন সুফিয়া তাকে খুব স্নেহ করে। সেও তাকে খুব শ্রদ্ধা করে। একমাত্র তারই কথা জাকির শোনে। বড় বোনের বাড়িতে মাসে অন্ততঃ দু'বার আসা চাই। গতকাল বিকেলে সে সমেশপুরে সুফিয়াদের বাড়িতে এসেছে। সুফিয়ার স্বামী গোফরান ও তাকে খুব ভালবাসে। তার লেখাপড়ার ব্যাপারে অনেক সাহায্য করে। এর আগে অনেকবার এলেও ছোটছেলে বলে যে এই গ্রামের অনেকে তাকে চেনে না। আর চিনবেই বা কি করে, সে যেদিন আসে তার পরের দিন চলে যায়।

জাকিরের দুলাভাই গোফরান বাবা মার একমাত্র সন্তান। তার বাবা ইয়াসির মিয়া খুব বিত্তশালী লোক। জমি জায়গা অনেক, বাড়ি ঘর সব পাকা। গ্রামের মধ্যে সেরা ধনী। ধর্ম কর্ম কিছু কিছু মেনে চলেন। স্ত্রীসহ হজ্ব করেছেন। কিন্তু খুব কৃপণ ও লোভী। আল্লাহ পাকের কি শান, উনি কৃপণ ও লোভী হলেও ওঁর ছেলে গোফরান খুব দীলদার ও ধার্মিক। গরিবদের প্রতি খুব সহানুভূতিশীল। অবশ্য ওঁর স্ত্রী আয়মন বিবি ও খুব দয়াবতী মহিলা। তিনি গরিব পাড়া-পড়শীদেরকে যতটা সম্ভব স্বামীর অগোচরে সাহায্য করেন। সেইজন্যে পাড়ার লোকজন বলাবলি করে, ইয়াসির মিয়া কৃপণ হলে কি হবে, ওঁর স্ত্রী ও ছেলে খুব দীলদার। ওদের জন্যেই ওঁর আজ এত উন্নতি।

গোফরান লেখাপড়ায় ভালো। সিরাজগঞ্জ কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করেছে। সে একজন ভালো ফুটবল খেলোয়াড়। আই.এ. পড়ার সময় এনায়েতপুরে তিনবার ম্যাচ খেলতে গিয়েছিল। এনায়েতপুর হাই স্কুলের সামনের মাঠে প্রথম যেদিন ম্যাচ খেলতে যায়, সেদিন সুফিয়াকে দেখে তার খুব পছন্দ হয়।

সুফিয়া ঐ স্কুলের ক্লাস নাইনের ছাত্রী। তখন মেয়েদের জন্য আলাদা স্কুল ছিল না। ছেলে মেয়েরা একসঙ্গে পড়ত। সেদিন বল খেলার জন্য দু'পিরিয়ড আগে ছুটি হয়ে যায়। সুফিয়া অন্যান্য মেয়েদের সাথে বলখেলা দেখছিল। সুফিয়া যেদিকে ছিল, সেদিকে গোফরানদের দলের থ্রো হয়। বলটা সুফিয়ার পায়ের কাছে ছিল। গোফরান থ্রো করতে এলে সুফিয়া বলটা নিয়ে তার হাতে তুলে দেয়।

গোফরান বলটা নেয়ার সময় সুফিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে কয়েক সেকেন্ডের জন্য আনমনা হয়ে পড়ে। তার সুন্দর মুখচ্ছবি দেখে গোফরানের মনে অজানা এক অনুভূতি বইতে শুরু করে। পরক্ষণে বাস্তবে ফিরে এসে থ্রো করে খেলতে শুরু করে। কিন্তু সুফিয়ার আনিন্দসুন্দর মুখের ছবি তার হৃদয়ে গেঁথে যায়। পরের ম্যাচে খেলতে গিয়ে গোফরানের চোখ সুফিয়াকে অনেক খুঁজল, কিন্তু দেখতে পেল না। ফাইনাল খেলার দিন তার সন্ধানী চোখ সুফিয়াকে দেখতে পেল। হাফ টাইমের সময় সরাসরি তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, আপনার বাড়ি কি এই গ্রামে?

সুফিয়া প্রথম দিন গোফরানের হাতে বল দেয়ার সময় তাকে দেখে মুগ্ধ হয়। তার তরুণী মনে কি যেন এক ধরণের শিহরণ বয়ে যায়। আজ এত মেয়ের সামনে তাকে কথা বলতে দেখে লজ্জা পেয়ে মাটির দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে সায় দিল।

গোফরান বলল, আপনার আব্বার নামটা বলবেন?

সুফিয়া মাথা নিচু করেই বলল, শামসুদ্দিন খাঁন।

গোফরান তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে সেখানে থেকে চলে এল।

সেদিন বাড়িতে এসে গোফরান মাকে বলল, এনায়েতপুরের একটা মেয়েকে আমার খুব পছন্দ। তাকে আমি বিয়ে করব।

আয়মন বিবি বললেন, আল্লাহ'র দুনিয়ায় পছন্দ করার মতো অনেক মেয়ে আছে। তুই এখন লেখাপড়া করছিস; আগে লেখাপড়া শেষ কর, তারপর বিয়ে করবি।

গোফরান বলল, বিয়ের পরও আমি লেখাপড়া করতে পারব। আমার লেখাপড়া শেষ হওয়া পর্যন্ত মেয়ের বাবা তার বিয়ে দিয়ে দেবেন।

আয়মন বিবি বললেন, তাতে কি হয়েছে? মেয়ের অভাব আছে নাকি?

গোফরান মাকে জড়িয়ে ধরে বলল, সেসব মেয়েকে আমার পছন্দ হবে না। তুমি আব্বাকে রাজি করাও। তারপর দেখবে, তোমার ছেলে কি রকম মেয়ে পছন্দ করেছে। আর পড়াশোনার ব্যাপারে দেখবে, আগের চেয়ে আরো ভালভাবে লেখাপড়া করছে।

আয়মন বিবি ছেলের কথায় হেসে উঠে বললেন, তোর আব্বা যদি রাজি না হন?

তুমি তাকে রাজি করাবে।

তিনি যদি আমার কথা না শোনেন?

তা হলে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে যেদিকে দু'চোখ যায়, সেদিকে চলে যাব।

আয়মন বিবি একমাত্র নয়নের মনির কথা শুনে আতঙ্কিত হয়ে বললেন, একথা বলতে পারলি? তুই চলে গেলে আমরা কাকে নিয়ে বাঁচব?

গোফরান বলল, তোমরা আমাকে যদি এত ভালোবাস, তা হলে আমি যাকে ভালবাসি তাকে ঘরে আনতে চাচ্ছ না কেন?

আয়মন বিবি বললেন, আমরা কি বলেছি আনব না। ঠিক আছে, তোর আব্বাকে ব্যবস্থা করতে বলব। মেয়ের বাবার নাম কি?

গোফরান বলল, শামসুদ্দিন খাঁন।

আয়মন বিবি বললেন, এবার যা মন দিয়ে পড়াশোন কর।

রাতে ঘুমাবার সময় আয়মন বিবি স্বামীকে ছেলের কথা বললেন।

ইয়াসির মিয়া শুনে খুব রেগে গিয়ে চুপ করে রইলেন।

আয়মন বিবি জানেন, স্বামী রেগে গেলে অন্যান্য পরুষদের মত চিল্লাচিল্লী না করে চুপ করে থাকেন। তাই তিনিও কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি ঘুমিয়ে গেছেন?

ইয়াসির মিয়া বললেন, না, ভাবছি।

কি ভাবছেন?

ভাবছি কি করা যায়।

ভেবে কিছু ঠিক করতে পারলেন?

গোফরানকে তুমি লাই দিয়ে মাথায় তুলেছ। এখন যদি তার বিয়ে না দিই, তা হলে সে গোপনে বিয়ে করে ফেলবে। ভেবেছিলাম, বি.এ. পাশ করার পর বিয়ে দেব।

তখন অনেক যৌতুক পাওয়া যেত। তবে এখন যা পাওয়া যাবে তাও কম না। এমন ঘর এমন বর পেলে মেয়ের বাবা জমি-জায়গা, বাড়ি-ঘর বিক্রি করে হলেও যৌতুক দিয়ে বিয়ে দেবে। কি আর করা যাবে বল, ছেলে যখন মেয়ে পছন্দ করেছে তখন বিয়ে না দিলে, সে হয়তো এমন কাজ করে ফেলবে, যার ফলে আমাদের মান ইজ্জৎ ছোট হয়ে যাবে। এনায়েতপুরের কার মেয়ে জিজ্ঞেস করেছিলে?

শামসুদ্দিন খাঁনের মেয়ে।

কি বললে?

হ্যাঁ, তাইতো গোফরান বলল।

শামসুদ্দিনকে আমি চিনি। তাদের বংশ ভালো হলে কি হবে, তারা খুব গরিব। তাদের বাড়ির মেয়ে এ বাড়ির বৌ হওয়া তো দূরের কথা, বাঁদী হওয়ার উপযুক্তও নয়। না না, এ হতে পারে না। তুমি গোফরানকে বলো, আমি তার বিয়ে বড় ঘরে, ভালো মেয়ের সঙ্গে দেব। নচেৎ লোকজনের কাছে আমি মুখ দেখাতে পারব না।

গোফরান যদি ঐ মেয়েকে ছাড়া অন্য কোথাও বিয়ে করতে রাজি না হয়?

রাজি হবে না মানে ওর বাপ রাজি হবে।

বাপ রাজি হলে তো হবে না, ওকে হতে হবে।

হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকেই রাজি হতে হবে। শামসুদ্দিনের নুন আনতে পান্তা ফুরায়। তার জমি জায়গা, ভিটে-মাটি যা আছে, তা সব বিক্রি করেও আমাদের দাবি মিটাতে পারবে না। থাক, তোমাকে কিছু বলতে হবে না, যা বলার আমিই বলব।

যা বলবেন, বুঝে সুজে বলবেন। নচেৎ হিতে বিপরীতে হয়ে যাবে।

সে কথা তোমাকে বলে দিতে হবে না। এখন ঘুমাও রাত হয়েছে। কথা শেষ করে ইয়াসির মিয়া পাশ ফিরে শুলেন।

পরের দিন সকালে নাস্তা খাওয়ার পর ছেলেকে ডেকে পাঠালেন ইয়াসির মিয়া।

গোফরান তখন পড়ছিল। এসে সালাম দিয়ে বলল, কেন ডেকেছ বল।

ইয়াসির মিয়া সালামের উত্তর দিয়ে বললেন, তুমি তোমার মাকে যেকথা বলেছ, তা হবার নয়। কারণ শামসুদ্দিন ভালো লোক হলে কি হবে, সে গরিব। তার সঙ্গে আমরা খেসী করতে পারি না। আমাদের একটা মান সম্মান আছে। তার মেয়ে আমাদের বাড়ির বাঁদী হবার উপযুক্তও নয়। আমাদের মান সম্মান ধূলোয় মিশে যাক, এটা কি তুমি চাও? বিয়ের খরচপত্র করার মতো যার ক্ষমতা নেই, সে কি করে যৌতুক দিবে? বড় ঘরের মেয়ে আনলে কত যৌতুক পাওয়া যাবে, সে কথা তোমার চিন্তা করা উচিত। আমার কথা শোন, মন দিয়ে পড়াশোনা করে বি.এ. পাশ কর। আমি ততদিনে তোমার জন্য বড় বংশ ও বড় ঘরের ভালো মেয়ের খোঁজ করে রাখব। একটা কথা মনে রেখ, যে যে সমাজের মানুষ, তাকে সেই সমাজেই মানায়।

গোফরান আব্বার কথা শুনতে শুনতে রেগে গেলেও সংযত হয়ে ছিল। আব্বার কথা শেষ হতে বলল, কয়েকটা কথা বলব; বেয়াদবি হলে মাফ করে দিও। গরিব বড়লোক আল্লাহ পাকের সৃষ্টি। গরিবদের আচার-ব্যবহার বেশিরভাগ খারাপ হলেও

তাদের মধ্যে কিছু লোক আছে, যারা বনেদি ঘরের এবং তাদের আচার ব্যাবহারও ভালো। আমি খোঁজ নিয়ে দেখেছি ঐ মেয়ের বাবা গরিব হলেও তাদের সব কিছু ভালো। আর বিয়ের খরচ ও যৌতুকের কথা যে বললে, তাতে আমি একমত নই। মেয়ের বাবা সামর্থ অনুযায়ী বিয়েতে খরচ করবেন। বিয়েতে মেয়ের বাবার কাছ থেকে দাবি করে কিছু নেয়া ইসলামে হারাম। ঐ রকম কামনা করাও কবিরা গোনহ। পাত্র পক্ষের দাবির জন্য আমাদের দেশের কত মেয়ের জীবন নষ্ট হচ্ছে, কখনও খোঁজ নিয়ে দেখেছ? দেখনি। দেখলে যৌতুকের কথা বলতে না। এর জন্য আল্লাহপাক তোমাদের মতো ধনীদের কাল কেয়ামতের ময়দানে পাকড়াও করবেন। আল্লাহ তোমাকে অনেক দিয়েছেন। পরের জিনিসের উপর আরও আশা করো কেন? তিনি যা দিয়েছেন, তাতে শোকর কর। নচেৎ তিনি অসন্তুষ্ট হবেন। ধন সম্পত্তি নদীর জোয়ার ভাঁটার মতো। কারো কাছে চিরস্থায়ী থাকে না। যাকে তুমি আজ গরিব বলে ঘৃণা করছ, আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাকে ধনী করে দিতে পারেন। অপর পক্ষে তোমাকে গরিব করেও দিতে পারেন। তিনি সর্বশক্তিমান। যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কারো এতটুকু কিছু করার ক্ষমতা নেই। মান সম্মানও তাঁরই হাতে। তিনি যাকে ইচ্ছা দেন, আবার কেড়েও নেন। এই সমস্ত ব্যাপারে আল্লাহপাক ক্বুরআনে বর্ণনা করেছেন, "বলুন ইয়া আল্লাহ, তুমিই সার্বভৌম শক্তির অধিকারী। তুমি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান কর এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজ্য ছিনিয়ে নাও এবং যাকে ইচ্ছা সম্মান দান কর আর যাকে ইচ্ছা অপমানে পতিত কর। তোমার হাতে রয়েছে যাবতীয় কল্যান। নিশ্চয় তুমি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশীল"[১]। একথা নিশ্চয় জান, যেখানে যৌতুক বেশি পাওয়া যায়, সেখানে মেয়ের কিছু না কিছু খুঁৎ থাকে। বৌ শুধু বড় ঘরের সুন্দরী মেয়ে হলে হয় না; সে যদি মুখরা বা বদরাগী হয় অথবা ধর্মের বিধি নিষেধ মেনে না চলে, তখন কি হবে? তখন তোমরা যেমন অশান্তি পাবে তেমিন আমিও পাব। ঐরকম মেয়েরা কোনোদিন সংসারে শান্তি আনতে পারে না। বড়লোকের সুন্দরী মেয়েরা সাধারণতঃ ঐ রকম হয়ে থাকে। অবশ্য সবাই যে খারাপ তা বলছি না? তবে ভালোর সংখ্যা খুব কম। বাবা মার মনে কষ্ট দিতে নেই, সে কথা আমি জানি। আমার কথা শুনে হয়তো তোমরা মনে কষ্ট পাচ্ছ। সেজন্যে মাফ চাইছি। আর একটা কথা না বলে পারছি না, প্রত্যেক পাত্র ও পাত্র পক্ষের উচিত, যৌতুকবিহীন বিয়ের ব্যবস্থা করা। কারণ এটা সরাসরি হারাম। হালাল জিনিসের সাথে কিছু পরিমাণ হারাম মিশে গেলে, সেই হালাল জিনিসও হারামে পরিণত হয়ে যায়। আমরা মুসলমান। আমাদের কি এটা করা উচিত? তা ছাড়া তুমি আল্লাহ'র ঘর ও নবী (দঃ) এর রওজা মোবারক দেখে এসেছ। আল্লাহপাক তোমাকে ধন-দৌলত, মান-সম্মান দিয়েছেন। তুমি তোমার হালাল জিনিসের সঙ্গে হারাম জিনিস মিশাতে চাচ্ছ কেন? আল্লাহপাককে ভয় করে এরকম মনোভাব পরিত্যাগ কর। এবার আমার নিজের কথা বলছি, হাদিসে পড়েছি, আমাদের নবী (দঃ) বলেছেন, "তোমারা সুন্দরী, অর্থ শালী ও ধার্মিকা মেয়ে বিয়ে করবে। এদের মধ্যে ধার্মিকা মেয়ে উত্তম।" যে মেয়েকে আমি পছন্দ করেছি সে গরিব হলেও ধার্মিকা। তাই এই মেয়েকেই আমি

বিয়ে করবই। এটাই আমার শেষ কথা। তাতে যদি তোমরা আমাকে ঘর থেকে বের করে দাও, তবু আমি আমার সংকল্প থেকে পিছু হটব না। তারপর গোফরান আব্বা আম্মার কাছ থেকে নিজের রুমে ফিরে এল।

ছেলের কথা শুনে ইয়াসির মিয়া প্রথম দিকে খুব রেগে গিয়েছিলেন। পরে তার সব কথা শুনে ভাবান্তার হল। গোফরান চলে যাওয়ার পর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে ভিজে কণ্ঠে বললেন, আল্লাহপাকের কাছে শুকরিয়া জানাই, তিনি আমাদেরকে এমন রত্ন দান করেছেন। গোফরান আমার জ্ঞানের দুয়ার খুলে দিয়েছে।

ছেলের কথা শুনতে শুনতে আয়মন বিবির চোখে আগেই পানি এসে গিয়েছিল। এখন স্বামীর কথা শুনে সেই পানি গড়িয়ে পড়তে লাগল। কোনো কথা বলতে পারলেন না। অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

ইয়াসির মিয়া ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বললেন, গোফরানের মা, জেনে রেখ, এতদিন আমি অন্ধকারের মধ্যে ছিলাম। আজ গোফরান আমাকে আলোর পথ দেখাল।

আয়মন বিবি শোকর আলহামদুল্লিাহ বলে বললেন, তাইতো চোখের পানি ফেলে আল্লাহপাকের শুকরিয়া আদায় করছি। আপনি তো বিষয় সম্পত্তি নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। ছেলেকে আমি আমার মনের মতো করে গড়ার চেষ্টা করেছি। তাতে যে আমি সফল হয়েছি, সেই জন্যে আমি আবার আল্লাহ পাকের দরবারে শতকোটি শুকরিয়া জানাচ্ছি। আপনি নিজে এনায়েতপুরে গিয়ে শামসুদ্দিনের মেয়ের সঙ্গে বিয়ের ব্যবস্থা করে আসুন।

ইয়াসির মিয়া বললেন, সে কথা তোমাকে বলে দিতে হবে না। মাস খানেকের মধ্যে তিনি সুফিয়াকে বৌ করে ঘরে নিয়ে এলেন।

গোফরান বাসর রাতে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করল, এ বিয়েতে তোমার মত ছিল কি না বলবে?

সুফিয়া মৃদু হেসে বলল, মত না থাকলে বিয়ে হল কি করে?

গোফরান বলল, অনেক ক্ষেত্রে চাপের মুখে অথবা ভয়ে মেয়েরা মত দেয়। তোমার আব্বা তো বড়লোকের ঘরে মেয়ের বিয়ে দিতে প্রথমে রাজি হন নাই। আমার আব্বার জীদে রাজি হয়েছেন। তাই জিজ্ঞেস করলাম।

সুফিয়া বলল, প্রথমে আমিও রাজি ছিলাম না। পরে যখন আমার এক চাচাতো বোনের কাছে আপনার পরিচয় জানতে পারলাম তখন থেকে...বলে থেমে গেল।

গোফরান বলল, থেমে গেলে কেন? তখন থেকে কি বলবে তো?

সুফিয়া বলল, আল্লাহকে জানাতাম, তিনি যেন এই বাঁদীকে আপনার জন্য কবুল করেন। তিনি আমার ফরিয়াদ কবুল করে আমাকে ধন্য করেছেন। সেইজন্যে তাঁর পাক দরবারে জানাই লাখলাখ শুকরিয়া। তারপর কদমবুসি করল।

গোফরান তাকে তুলে বুকে চেপে ধরে বলল, আমিও সেই পরওয়ার দেগারের পাক দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া জানাচ্ছি, যিনি আমার মনস্কামনা পূরণ করে সেই বাঁদীকে আমার হৃদয়ের বেগম করে আমাকে কৃতার্থ করেছেন। তারপর তাকে পাশে বসিয়ে বলল, যদিও মনে হচ্ছে তুমি ধর্মের অনেক জ্ঞান রাখ এবং সেইসব মেনেও চল, তবু বলব, আমার অনেক বই আছে, সেগুলো পড়তে। সব থেকে প্রথম পড়বে বেহেস্তিজেওর আমি তোমাকে আদর্শ স্ত্রী ও আদর্শ বৌ করে গড়তে চাই। আজ থেকে আর কোনোদিন নিজেকে বাঁদী বলবে না।

সুফিয়া বসে পড়ে স্বামীর দু'পা জড়িয়ে ধরে চোখের পানি ফেলতে ফেলতে বলল, ইনশা আল্লাহ আমি আপনার ইচ্ছা পূরণ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করব। আপনার সহযোগীতা শুধু কামনা করি।

গোফরান তাকে আবার বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করে বলল, তুমি কাঁদছ কেন? ইনশা আল্লাহ আমি তোমাকে নিশ্চয় সহযোগীতা করব। তারপর তার চোখের পানি মুছে দিয়ে বলল, আজকের রাতে কাঁদতে নেই। হাস বলছি, নচেৎ গালে কামড়ে দেব।

সুফিয়া হেসে উঠে লজ্জা পেয়ে স্বামীর বুকে মুখ গুঁজে বলল, আস্তে কামড়াবেন, নচেৎ ব্যথা পেলে আবার কেঁদে ফেলব।

গোফরানও হেসে উঠে বলল, দূর বোকা, সত্যি সত্যি কামড়াব নাকি? তোমার কান্না থামাবার জন্য বললাম। এবার একটা কথা জিজ্ঞেস করব, সঠিক উত্তর দেবে তো?

মিথ্যে বলা যে হারাম, তা আমি জানি।

সুবহান আল্লাহ বলে গোফরান তাকে একটা চুমো খেয়ে বলল, সেই প্রথম ম্যাচ খেলার দিন তুমি যখন বলটা কুড়িয়ে আমার হাতে দিলে তখন তোমাকে দেখে মনের মধ্যে ভীষণ আনন্দ অনুভূত হয়। সেই সময় মনে মনে স্থির করেছিলাম, যেমন করে হোক তোমাকে বিয়ে করবই। আমাকে দেখে তোমার কিছু মনে হয়নি?

সুফিয়া বলল, সে দিন আমি খুব মুগ্ধ হয়েছিলাম।

দ্বিতীয় ম্যাচের দিন তোমাকে অনেক খুঁজেছি; কিন্তু পাইনি। কারণটা বলবে?

ঐ দিন আমার জ্বর হয়েছিল, তাই আসনি।

আমি আই.এ. পড়ছি। বি.এ. পর্যন্ত পড়ার খুব ইচ্ছা। তুমি তো নাইনে পড়তে, বাড়িতেই পড়াশোনা করবে। পরীক্ষার ব্যবস্থা আমি করে দেব। তোমাকে ম্যাট্রিক পাশ করতেই হবে। কি, পারবে না?

আপনার সহযোগিতা পেলে ইনশা আল্লাহ পারব।

পড়াশোনার ব্যাপারে তুমি আমাকে সহযোগীতা করবে না?

কি রকম সহযোগীতা আপনার দরকার বলবেন, আমার প্রাণের বিনিময়েও ইনশা আল্লাহ আমি করব।

গোফরান তাকে আদর দিয়ে বলল, সে কথা পরে বলব। এখন বল, তুমি আমাকে এতক্ষণ আপনি করে বলছ কেন? প্রথম দিকে মনে করেছিলাম, লজ্জায় হয়তো বলছ।

কেন, এই সম্বোধন, কি আপনার ভালো লাগছে না?

প্রথম দিকে ভালো লাগলেও এখন লাগছে না।

কেন?

আমার কাছ থেকে দূরে রয়েছ মনে হচ্ছে।

তা কেন? আপনার কাছেই তো রয়েছি।

সে কথা ঠিক। তবে মনের কাছ থেকে দূরে রেখেছ। অথচ প্রথম দেখার পর থেকে আমি তোমাকে মন প্রাণ উজাড় করে ভালবেসেছি।

সুফিয়া ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সামলে নিয়ে ভিজে গলায় বলল, আল্লাহ পাকের কসম খেয়ে বলছি, আপনি যা ভাবছেন তা নয়। আমি গরিব ঘরের মেয়ে। আপনাদের সমাজের সঙ্গে আমার কোনো পরিচয় নেই। আল্লাহ মেহেরবানী করে যতটুকু এলেম দান করেছেন, সেই এলেম আমাকে আপনার সঙ্গে সম্মানজনক সম্বোধনে কথা বলতে বলেছে। এটা যদি আমার অন্যায় হয়ে থাকে, তবে মাফ করে দিন বলে সুফিয়া পায়ে হাত দেয়ার জন্য বসতে গেল।

গোফরান তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, তোমাকে ভুল বুঝে আমিই অন্যায় করেছি। তুমি মাফ চাইবে কেন? বরং আমারই চাওয়া....।

সুফিয়া তাকে কথাটা শেষ করতে দিল না। নিজের গাল তার মুখে চেপে ধরে বলল, ওকথা আর কোনো দিন বলবেন না। কি সম্বোধনে কথা বললে আপনি খুশি হবেন, তা আমার জানা উচিত ছিল। এখন বলে দিলে ধন্য হতাম।

গোফরান তার গালে আস্তে কামড়ে দিয়ে বলল, তুমি করে বলবে। এখন আর তোমার চোখে পানি দেখতে চাই না। রাত শেষ হয়ে আসছে। সারাজীবনের মধ্যে যে রাতের জন্য মানুষ উন্মুখ হয়ে থাকে, সেই রাত কেঁদে কেঁদে শেষ করতে চাও নাকি? তাড়াতাড়ি কান্না থামিয়ে চোখ মুখ মুছে ফ্রেস হয়ে নাও। নচেৎ সত্যি সত্যি কামড়ে গালের গোস্ত তুলে নেব।

সুফিয়া তাড়াতাড়ি চোখ মুখ মুছতে মুছতে বলল, বড়লোকদের ছেলেদের সম্বন্ধে অনেক খারাপ খারাপ কথা শুনেছি। কিন্তু আপনাকে থুড়ি বলে ফিক করে হেসে বলল, তোমাকে যত জানছি তত অবাক হচ্ছি। আমার ধারণা যেমন পাল্টে যাচ্ছে তেমনি সবকিছু স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে।

গোফরান বলল, তোমার গালে কামড়াতেও যখন স্বপ্ন ভাঙ্গল না তখন বলে তার ঠোঁটে একটু জোরে কামড়ে দিল।

সুফিয়া উহ করে উঠে লজ্জায় লাল হয়ে স্বামীকে জড়িয়ে ধরে বলল, এই দুষ্টু, আমাকে লাগেনি বুঝি?

গোফরান বলল, লাগুক। তোমার স্বপ্ন ভেঙ্গেছে কি না বল। না হলে আবার কামড়াব বলে ঠোঁটের কাছে মুখ নিয়ে এল।

এবার সুফিয়া স্বামীর ঠোঁটে ঠোঁট রেখে বলল, ভেঙ্গেছে।

গোফরান বলল, এস তা হলে আজকের রাতকে স্বার্থক করি, এই কথা বলে তাকে শুইয়ে দিয়ে জড়িয়ে ধরল।

ইয়াসির মিয়া রহিম উদ্দিনের বাড়িতে বিয়ের কথা বলতে গিয়ে সুফিয়াকে দেখে খুব একটা সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। এমনি চলনসই মেয়ে। কিন্তু তাকে বৌ করে আনার পর তার কথা-বার্তা, কাজ-কর্ম ও আচার-ব্যবহার দেখে অন্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছেন। একদিন স্ত্রীকে বললেন, আমাদের গোফরান যেমন আল্লাহ আমাদেরকে তেমিন বৌমা দিয়েছেন।

আয়মন বিবি বললেন, আপনার কথাই ঠিক। এমন বৌ পাওয়া আজকালের যুগে ভাগ্য। আর আপনি কি না যৌতুকের জন্য এই বৌ ঘরে আনতে চাননি। একমাত্র ছেলের বিয়ে বড় ঘরে দিয়ে অনেক সোনা-দানা, টাকা-পয়সা পেতেন ঠিক; কিন্তু এমন গুণবতী বৌ পেতেন না।

ইয়াসির মিয়া বললেন, সে সব কথা বলে আমাকে লজ্জা দিও না। তোমার কথাই ঠিক, আমাদের ভাগ্য সত্যিই ভালো। নচেৎ সুফিয়ার মত বৌ আমরা পেতাম না।

গোফরান বিয়ে করে নিজে যেমন মন দিয়ে পড়াশোনা করে বি.এ. পাশ করল, তেমনি স্ত্রীকেও সহযোগীতা করে ঘরে পড়িয়ে ম্যাট্রিক পাশ করাল।

বেশ কয়েক বছর আগের ঘটনা। গোফরান যে বছর ক্লাস নাইনে উঠল, সেই বছর হঠাৎ একদিন গ্রামের লোকজন জানতে পারল, কবরস্থানের পাশে বন জঙ্গলে ভরা পোড়ো জমিটার মাঝখানে একজন ফকির ঘর উঠিয়ে বাস করছে। করবস্থানে ম্যাইয়েতকে দাফন করার সময় ছাড়া অন্য সময় সেদিক কেউ যায় না। কারণ প্রথমত করবস্থানটা গ্রামের শেষ প্রান্তে। দ্বিতীয়ত কবরস্থানের পাশের পোড়ো জমিটায় রাতের

বেলা নানারকম আলো ও বিভিন্ন পশু পাখীর উদ্ভট ডাক শোন যায়। গ্রামের মুরুব্বিরা বললেন, আমরা মুরুব্বিদের মুখে শুনেছি, ঐখানে জীন পরীরা বাস করে। সেই সব মুরুব্বিদের অনেকে সেখানে জীনেদেরকে যাতায়াত করতে দেখেছে। মোট কথা ভুলেও কেউ ঐ দিকে পা বাড়ায় না। ঐ জমিটার পর মাঠ এবং মাঠের পর অন্য গ্রাম। যদি কোনো গরিব লোক জ্বালানীর জন্য কাঠ বা গাছের শুকনো পাতা অথবা ডাল পালা নেয়ার জন্য ওখানে যায়, তা হলে ফিরে আসার পর সে বেশি দিন বাঁচে না। জ্বর অথবা পায়খান বমি হয়ে মারা যায়। আগের যুগের মতো এখন সেখানে জীন পরী কেউ না দেখলেও এই রকম ঘটনায় দু'তিনজন মারা যাওয়ার পর আর কেউ সেখানে যাওয়া তো দূরের কথা, ভুলেও কেউ ঐ জায়গার নাম নেয় না। সেই ভয়ঙ্কর জায়গায় এক ফকির ঘর করে বাস করছে শুনে মুরুব্বিরা খুব অবাক হল। জায়গাটা ষোলআনার। ইয়াসির মিয়া শুনে ভাবলেন, ঐ লোক হয় আল্লাহ পাকের পেয়ারা বান্দা অথবা ঐ লোকের জীন হাসিলের আমল আছে। ব্যাপারটা নিয়ে তিনি মাথা ঘামালেন না। কিন্তু গ্রামের অন্যান্য মুরুব্বিরা দু'তিনজন সাহসী যুবককে ফকিরের পরিচয় জানার জন্য পাঠালেন।

তারা কবরস্থানের রাস্তায় না গিয়ে মাঠের রাস্তা দিয়ে সেই জমিটার ধারে গিয়ে পৌঁছেছে এমন সময় একজন ফকির ধরণের নওজোয়ান লোককে তাদের দিকে আসতে দেখল। তার গায়ে অসংখ্য তালি দেয়া পরিস্কার ঝুলপিরান মাথায় পাগড়ী। কাছে এসে লোকটা সালাম দিল।

তাদের মধ্যে একজন সালামের উত্তর দিয়ে জিজ্ঞেস করল, এই যে মিয়া, আপনি কে? এখানে ঘর তুলেছেন কেন?

লোকটা বলল, বাবা, আমি মুসাফির মানুষ। কিছুদিন এখানে থাকব, তারপর চলে যাব। তাই আপনাদেরকে বিরক্ত না করে এখানে থাকার ব্যবস্থা করেছি।

আপনার দেশ কোথায়?

আমার নির্দিষ্ট কোনো দেশ নেই। যেখানে থাকি সেখানেই দেশ।

কিন্তু গ্রামের লোকজনকে আপনার জানান উচিত ছিল। এটা ষোলআনার জায়গা।

জানাব তো নিশ্চয় দু'দিন হল এসেছি। সময় করে উঠতে পারিনি।

ঠিক আছে, তাই জানাবেন বলে তারা ফিরে এসে ব্যাপারটা মুরুব্বিদেরকে জানাল।

মুরুব্বিরা বেশ অবাক হয়ে বললেন, তাই না কি? তা হলে অপেক্ষা করেই দেখা যাক লোকটা এসে কি বলে?

পরের দিন ছিল শুক্রবার। জুম্মার নামায পড়তে সেই লোকটা মসজিদে এল। নামাযের পর সকলের সামনে বলল, আমি একজন মুসাফির। আমার নাম নেসার। সঙ্গে আমার স্ত্রী ও একটা ছোট্ট মেয়ে আছে। আল্লাহপাক এখানে যতদিন আমাদের রেখেছেন ততদিন থাকব, তারপর চলে যাব। মুসলমান ভাই হিসাবে আমার অনুরোধ, আপনারা থাকার অনুমতি দেবেন। আমি আপনাদের সকলের কাছে ওয়াদা করছি, আমার দ্বারা আপনাদের কোনো ক্ষতি হবে না।

তার কথা শুনে লোকজন নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল, লোকটার কথা বার্তা শুনে মনে হচ্ছে আলেম লোক। সেখানে হরমুজ আলি নামে একজন মুরুব্বি ছিলেন। তিনি খুব পরহেজগার ও মোত্তাকীন লোক। গ্রামের সকলে ওঁনাকে খুব সম্মান করে। বয়স প্রায় আশির মতো। চুল দাড়ি পেকে সব সাদা হয়ে গেছে। তিনি লোকটিকে উদ্দেশ্য করে বললেন, মুসলমান ভাই হিসাবে আমরা না হয় আপনাকে অনুমতি দিলাম। কিন্তু আপনি ওখানে স্ত্রী ও বাচ্চা, মেয়ে নিয়ে থাকবেন কি করে? একে তো কবরস্থানের পাশে। তার উপর জায়গাটা খুব গরম। গভীর রাতে ওখানে অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস দেখা যায়।

নেসার বলল, তাতে আমাদের কোনো অসুবিধা হবে না। জানেন না, মসজিদ ও কবরস্থান হল সব থেকে নিরাপদ জায়গা? আল্লাহপাক ইনসানকে সব মাখলুকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ করে পয়দা করেছেন। ইনসানকেই অন্যান্য সৃষ্টজীব ভয় করে। ইনসান একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করবে না। আমাদের জন্য কোনো চিন্তা করবেন না। আপনারা আমাদেরকে যে থাকবার অনুমতি দিলেন, সেটাই যথেষ্ঠ। আল্লাহ আপনাদের ভালো করবেন। আর আমিও সে জন্যে আল্লাহ পাকের শুকরিয়া জানিয়ে আপনাদেরকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

তার কথা শুনে সকলে ভাবল, লোকটা হয়তো সাধারণ মানুষ নয়। মুরুব্বিরা শলাপরামর্শ করে বললেন, ঠিক আছে, আপনি যতদিন ইচ্ছা থাকুন, আমাদের কোনো আপত্তি নেই।

নেসার আর কিছু না বলে সালাম জানিয়ে চলে গেল।

সেই থেকে আজ আট দশ বছর ধরে নেসার এই গ্রামে বাস করছে। কিন্তু তাকে বড় একটা দেখা যায় না। কোথায় যায়, কি করে কেউ জানতে পারে না। তবে মাঝে মধ্যে শুক্রবার জুম্মার নামায পড়তে মসজিদে আসে। গ্রামের লোকালয় থেকে জায়গাটা একটু দূরে বলে কোনো মেয়ে বা পুরুষ তাদের ঘরে যায় না। প্রথম প্রথম যদি কোন সময় কোনো বুড়ি তার স্ত্রী ও মেয়েকে দেখবার জন্য যেত, তখন নেসারের স্ত্রী ঘোমটা দিয়ে তাদের খেদমত করত এবং ভালোমন্দ জিজ্ঞেস করত। কাউকেই সে মুখ দেখাত না। কোনো বুড়ি যদি বলত, পর পরুষদের সামনে মুখ ঢেকে রাখা আল্লাহ ও রসুল (দঃ) এর হুকুম; কিন্তু মেয়েদের সামনে তো নিষেধ নয়। তখন নেসারের স্ত্রী বলত, আপনি ঠিক কথা বলেছেন, কিন্তু আমার স্বামীর হুকুম, মেয়ে পুরুষ কারো সামনে মুখ খুলতে পারবে না। আপনিই বলুন, স্বামীর হুকুম মেনে চলা আমার উচিত কি না?

গ্রামের অন্যান্য মেয়েরা সেই বুড়ির মুখে এই কথা শুনে অনেকে তাকে দেখতে গেছে; কিন্তু কেউই নেসারের স্ত্রীর মুখ দেখতে পাইনি। তবে তাদের মেয়েকে সবাই দেখেছে। মেয়েটা দেখতে যেন পরীর মেয়ের মতো। তাকে দেখলে কেউ মানুষের বাচ্চা বলে বিশ্বাস করবে না। প্রথম দিকে বেশ কিছু দিন নেসার ও তার স্ত্রী এবং মেয়েকে নিয়ে গ্রামের মেয়ে পুরুষ অনেক জল্পনা কল্পনা করলেও পরে আর কেউ তাদের নিয়ে মাথা ঘামায় না। তবে সবাইয়ের ধারণা, নেসার মানুষ হলেও জীনদের নিয়ে তার কারবার। নচেৎ ঐরকম জায়গায় সে স্ত্রী ও মেয়ে নিয়ে বাস করতে পারত

না। আর তার স্ত্রী পরী। তাই কাউকে মুখ দেখায় না। একরকম ভয়েই কেউ তাদের বাড়িতে যায় না, আর তাদের কথা আলোচনা ও করে না। সবাই তাকে নেসার ফকির বলে।

নেসার ফকির মেয়ের নাম রেখেছেন আজরা সাদিয়া। ডাক নাম সাদিয়া। সাদিয়ার বয়স যখন পাঁচ পছর হল তখন একদিন নেসার ফকির তাকে গ্রামের মক্তবে ভর্তি করে দিলেন। মক্তবের মৌলবী অন্য গ্রামের লোক হলেও নেসার ফকিরের সম্বন্ধে অনেক কিছু শুনেছেন। জুম্মার দিনে মসজিদে অনেকবার দেখেছেনও । ওঁর ধারণা গ্রামের লোকদের মতো। তাই সাদিয়াকে তিনি নিজের পাশে বসিয়ে পড়ান। সাদিয়া এমন পোষাক পরে মক্তবে আসে যে, শুধু তার চোখ দুটো দেখা যায়। সে মক্তবের অন্যান্য ছেলেমেয়েদের সাথে মিশে না। এমন কি কারো সাথে কথাও বলে না। কেবল মাত্র মৌলবীর কাছে সবক নেয় এবং দেয়।

গ্রামের লোকজন যখন জানতে পারল, নেসার ফকিরের মেয়ে মক্তবে পড়তে আসে তখন তারা তাদের ছেলেমেয়েদেরকে সাবধান করে বলে দিল, তারা যেন নেসার ফকিরের মেয়ের সঙ্গে মেলামেশা না করে।

নেসার ফকির মেয়েকে মক্তবে ভর্তি করার সময় মৌলবীকে বলেছিল, আরবি পড়ান হয়ে গেলে কিছুক্ষণ যেন তাকে বাংলা পড়ান। সে জন্যে আলাদা বেতন দেবেন। সাদিয়াকে মক্তবে যাতায়াত করতে অনেকে দেখলে ও সাহস করে তাকে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করে না। প্রায় দু'বছর হতে চলল সাদিয়া মক্তবে পড়ছে।

আজ জাকির দাঁত মাজতে মাজতে সাদিয়াকে দেখেছে। সেও একটু আধটু নেসার ফকিরের কথা শুনেছে। কিন্তু তার মেয়ে যে মক্তবে পড়ে তা শোনেনি। তাই মুখ ধুয়ে ঘরে আসার সময় হঠাৎ তার মনে হল, আমাদের দেশের মেয়েরা বোরখা পরলেও ঐরকম বোরখা পরে না। তা হলে মেয়েটা কি নেসার ফকিরের? কথাটা মনে হতে তাকে ভালো করে দেখার কৌতুহল জাগল। ঘরে এসে নাস্তা খাওয়ার সময় বুবুর সামনে দুলাভাইকে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা দুলাভাই, নেসার ফকিরের স্ত্রী নাকি পরী?

গোফরান হেসে উঠে বলল, সত্য মিথ্যে বলতে পারব না। তবে সবাই ঐকথা বলে।

সে নাকি মেয়েদেরকেও মুখ দেখায়নি, এটাও সত্যি?

হ্যাঁ সত্যি। তবে এটা শোনা কথা।

তাদের নাকি একটা মেয়ে আছে? সেও পরীর মতো দেখতে?

গোফরান আবার হেসে উঠে বলল, কি ব্যাপার বড় কুটুম, এত খোঁজ নিচ্ছ কেন?

জাকির বলল, বারে, শোনা কথা সত্য মিথ্যা যাঁচাই করব না?

গোফরান বলল, তা অবশ্য ঠিক কথা বলেছ। কিন্তু আমরা তো নেসার ফকিরের স্ত্রীকে ও তার মেয়েকে দেখিনি, যে প্রমাণ দেব। তবে তার মেয়ে সারাশরীর ঢেকে মক্তবে আসে।

জাকির শুধু ও বলে চুপ করে চিন্তা করল, মক্তবের ঐ মেয়েটাই তা হলে নেসার ফকিরের? দুলাভাই নাস্তা খেয়ে বাইরে চলে যাওয়ার পর বুবুকে বলল, আজ মক্তবে কালো বোরখা পরা একটা মেয়েকে দেখলাম; ঐ মেয়েটা কে তুমি জান?

সুফিয়া বলল, ঐ তো নেসার ফকিরের মেয়ে।

জাকির বলল, মেয়েটাকে দেখে আমারও তাই মনে হয়েছিল। তাকে তা হলে ভালো করে দেখতে হয়।

সুফিয়া ছোট ভাইয়ের ডানপিটে স্বভাব জানে। তার কথা শুনে আতঙ্কিত হয়ে বলল, কিন্তু সাবধান, তার সঙ্গে কথা বলতে যাবি না। শুধু দূর থেকে দেখবি।

জাকির বলল, কেন? কথা বললে কি হবে?

সুফিয়া বলল, শুনিসনি নেসার ফকিরের বৌ পরী? নেসার ফকির অনেক জীন বস করে রেখেছে। তারা তার স্ত্রী ও মেয়েকে পাহারা দেয়।

জাকির বলল, জীন কি বুবু?

সুফিয়া বলল, তুই ছেলেমানুষ বুঝবি না। আল্লাহ মানুষকে যেমন মাটি থেকে তৈরি করেছেন তেমনি জীনকে আগুন থেকে তৈরি করেছেন। তাই জীনেরা মানুষের থেকে বেশি শক্তিশালী। আর জীনদের বেশিরভাগ আল্লাহপাকের নাফরমান। তারা মানুষের অনেক ক্ষতি করে। নেসার ফকিরের মেয়ের সঙ্গে সব সময় একটা জীন থাকে। তুই তার কাছে যাবি না, দূর থেকে দেখে চলে আসবি বুঝেছিস?

জাকির বুবুর কথা শুনে খুব অবাক হল। কিন্তু জীনের কথাটা বিশ্বাস করতে পারল না। বলল, সত্যি কি জীন বলে কিছু আছে?

সুফিয়া বলল, আছে। তুই বড় হয়ে কুরআনের তফসীর পড়িস, তা হলে জীনদের সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারবি। এখন যা বললাম মনে রাখবি।

জাকির বলল, ঠিক আছে, রাখব। এখন যাই তা হলে?

সুফিয়া বলল, এতক্ষণে তো মক্তবের ছুটি হয়ে গেছে। আজ তুই থাক, কাল সকালে সে যখন মক্তবে আসবে তখন দেখবি।

পরের দিন সকালে জাকির কবরস্থানের রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণ পরে আপাদমস্তক ঢাকা সেই মেয়েকে আসতে দেখে একটা গাছের আড়ালে সরে গেল। মেয়েটা যখন কাছে এল তখন তার শুধু চোখ দুটো দেখতে পেল। আড়াল থেকে বেরিয়ে বলল, এই মেয়ে একটু দাঁড়াও।

সাদিয়া চমকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর জাকির কাছে এলে তার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে দ্রুত চলে গেল।

জাকির সেইখানেই তার ফেরার অপেক্ষায় রইল। একে কবরস্থান তার উপর জায়গাটা গ্রামের শেষ প্রান্তে। লোকজন বড় একটা এদিকে আসে না। নির্জন নিঝুম জায়গা। কবরস্থানের গাছপালায় যে সব পাখীরা বাসা বেঁধে আছে, মাঝে মাঝে শুধু তাদের নানারকম ডাক শোনা যাচ্ছে। অন্য যে কোনো ছেলে বা লোক এখানে একাকি থাকতে ভয় পাবে। কিন্তু জাকির খুব সাহসী ছেলে। কোনো কিছুতে ভয় পায় না। সাদিয়া চলে যাওয়ার পর সেই গাছের গোড়ায় বসে রইল।

ঘণ্টা দুই পর সাদিয়াকে ফিরতে দেখে উঠে গাছের আড়ালে সরে গেল। কাছাকাছি এলে জাকির তার পথরোধ করে বলল, তখন তাড়াতাড়ি করে চলে গেলে কেন?

সাদিয়া কটমট করে তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল।

জাকির ও তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। অন্য যে কেউ হলে সাদিয়ার দৃষ্টিতে ভয় পেত। জাকির ভয় পেল না। বরং জিজ্ঞেস করল, তুমি আমার কথার উত্তর দিচ্ছ না কেন?

সাদিয়া দৃষ্টি সরিয়ে মাথা নিচু করে বলল, দেরি হলে ওস্তাদজীকে কি বলতাম? আপনি সেই তখন থেকে এখানে রয়েছেন?

হ্যাঁ।

আপনার ভয় করে না?

কিসের ভয়? ভয় ডর আমার লাগে না। তোমার নাম কি?

আজরা সাদিয়া। আব্বা আম্মা সাদিয়া বলে ডাকেন।

বাহ! তোমার নামটা তো খুব সুন্দর। নামের মানে জান?

জি জানি। আব্বা শিখিয়েছেন, কুমারী সৌভাগ্যবতী।

আমার নাম জানতে ইচ্ছা করছে না?

জি করছে, বলুন।

বখতিয়ার জাকির।

মানে বলুন।

সৌভাগ্যবান স্মরণকারী। আমার আব্বা নেই, মক্তবের মৌলবী শিখিয়েছেন।

এবার আমি যাই?

আর একটু থাক না। তোমাকে আমার খুব ভালো লাগছে। আবার কবে দেখতে পাব তার কোনো ঠিক নেই।

কেন?

আমার বাড়ি তো এখানে নয়। আট দশমাইল দূর এনায়েত পুরে।

এখানে কোথায় এসেছেন?

এখানে আমার বড় বোনের বাড়ি। তার মুখে তোমার কথা শুনে তোমাকে দেখতে এলাম।

এবার আমি যাই। দেরি হলে আম্মা বকবেন।

আমি আজ বাড়ি চলে যাব। সামনের মাসে আবার আসব। তখন এখানে তোমার সাথে দেখা করব। আমার কথা তোমার মনে থাকবে?

জি থাকবে। এবার তা হলে আসি.... কথাটা সাদিয়া শেষ করতে পারল না।

জাকির হঠাৎ করে তার মুখের কাপড় সরিয়ে দিল।

সাদিয়া চমকে উঠে তাড়াতাড়ি কাপড় দিয়ে আবার মুখ ঢেকে ফেলল। তারপর ছুটে পালিয়ে গেল।

জাকির মাত্র চার পাঁচ সেকেণ্ড সাদিয়ার গোটামুখ দেখতে পেয়েছে। দেখে তার জ্ঞান লোপ পাওয়ার উপক্রম। যখন তার হুঁশ হল তখন দেখল, সে একা দাঁড়িয়ে আছে। আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সেখান থেকে চলে এল।

এরপর থেকে জাকির প্রতি মাসে দু'তিনবার এসে কবরস্থানে সেই জায়গায় সাদিয়ার সঙ্গে দেখা করা তার নেশা হয়ে দাঁড়াল। জাকির এসে প্রথমে গাছের আড়ালে

লুকিয়ে থাকবে। তারপর সাদিয়া কাছে এলে তার পথ আগলে বলবে, তোমাকে দেখতে এলাম, মুখের কাপড় সরাও নচেৎ আমি সরিয়ে দেব। সাদিয়া প্রথমে কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবে। তারপর মুখের কাপড় সরিয়ে বলবে, আমাকে দেখতে আসেন কেন? জাকির বলবে, তোমাকে দেখতে খুব ভাল লাগে। তাই অতদূর থেকে আসি। আপনাকেও আমার দেখতে খুব ভাল লাগে। আবার আসবেন বলে হেসে উঠে সাদিয়া ছুটে পালিয়ে যাবে। এভাবে একবছর পার হয়ে গেল।

এর মধ্যে সাদিয়ার মক্তব্যের পড়া শেষ হতে নেসার ফকির মেয়েকে সরকারী প্রাইমারী স্কুলে ক্লাস থ্রিতে ভর্তি করে দিলেন। স্কুলেও সাদিয়া ঐরকম পোশাক পরে আসে। স্কুলের শিক্ষকরা নেসার ফকিরের সম্বন্ধে অনেক কিছু শুনেছেন। তাই তারা সব ছেলেমেয়েদের বলে দিলেন, কেউ যেন সাদিয়াকে বিরক্ত না করে। সে যদি কারো সাথে মেলামেশা না করে, তা হলে তারাও যেন সাদিয়ার সাথে মেলামেশা না করে। সাদিয়া স্কুলের ঘণ্টা পড়ার দু'একমিনিট আগে এসে শেষ বেঞ্চে বসে। আবার ছুটির ঘণ্টা পড়ার সাথে সাথে ক্লাস থেকে বেরিয়ে সোজা বাড়ি চলে যায়। প্রাইমারীর পড়া শেষ হতে নেসার ফকির মেয়েকে আর হাইস্কুলে পড়ালেন না। বাড়িতে নানারকম ধর্মীয় বই এনে দিয়ে পড়তে বললেন।

এতদিন জাকির প্রতিমাসে সাদিয়ার সঙ্গে নিয়মিত কবরস্থানের নির্দিষ্ট জায়াগায় দেখা করেছে। এ বছর সে এইচ.এস.সিতে চার বিষয়ে লেটার পেয়ে বাণিজ্য বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে বেলকুচি ডিগ্রী কলেজে ভর্তি হল। তারপর একদিন শমেসপুরে এসে সাদিয়াকে খবরটা শোনাবার জন্য কবরস্থানের সেই জায়গায় এসে অপেক্ষা করতে লাগল।

জাকির সাদিয়ার কাছে গতবারে এসে শুনেছে, তার আব্বা তাকে আর হাইস্কুলে পড়াবেন না। তাই সেদিন জাকির কবে আসবে বলে বলেছিল, তুমি ঐদিন এই সময়ে এখানে আসবে। কিন্তু কলেজে ভর্তি হওয়ার ব্যাপারে ঐদিন আসতে পারেনি, পরের দিন এসেছে। সাদিয়ার আসার সময় পার হয়ে যাওয়ার পরও প্রায় তিন ঘণ্টা সেখানে বসে রইল। ভাবল, কাল এসে ফিরে গেছে বলে হয়তো অভিমান হয়েছে। আজ এসেছি কিনা দেখতে নিশ্চয় আসবে। দুপুর হয়ে যেতেও যখন সাদিয়া এল না তখন ভারাক্রান্ত মনে বুবুদের ঘরে এল।

সুফিয়া তাকে দেখে বলল, কিরে, সেই ন'টার সময় নাস্তা খেয়ে বেরিয়ে গেলি, আর পাত্তা নেই। এতক্ষণ কোথায় ছিলি?

জাকির বলল, কোথায় আবার যাব? তোমাদের গ্রামটা ঘুরে দেখলাম।

সুফিয়া বলল, প্রতিবারেই তো ঐ একই কথা বলিস। এতদিন দেখছিস, তবু তোর গ্রাম দেখা শেষ হল না? গ্রাম দেখতে যাস, না অন্য কিছু দেখতে যাস?

জাকির হেসে উঠে বলল, তুমি যে কি বল বুবু? গ্রামে আর কিছু দেখার আছে নাকি?

সুফিয়া বলল, নাই থাক, এবার যা গোসল করে আয়, বেলা ক'টা বেজেছে খেয়াল করেছিস?

জাকির আর কিছু না বলে লুঙ্গী গামছা নিয়ে গোসল করতে চলে গেল।

খাওয়া দাওয়ার পর জাকির সেদিন সন্ধ্যে পর্যন্ত কবরস্থানের সেই জায়গায় সাদিয়ার জন্য অপেক্ষা করে হতাশ হয়ে ফিরে এল। পরের দিন শুক্রবার। জাকির নামায পড়া অনেক আগে ছেড়ে দিয়েছে। সে জন্য তাকে মায়ের ও বড়ভাইয়ের অনেক বকুনী সহ্য করতে হয়। সুফিয়া ও গোফরান তাকে নামায পড়তে বলে। কিন্তু জাকির কারো কথা কানে তোলে না। আজও সে সাদিয়ার সঙ্গে দেখা করার জন্য সকালে নাস্তা খাওয়ার পর কবরস্থানে গিয়েছিল। কিন্তু সাদিয়া আসেনি। সেখানে দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষা করে ফিরে এসে মক্তবের বারান্দায় বসে বসে চিন্তা করছিল, কি করে সাদিয়ার দেখা পেতে পারে। এমন সময় একটা ফকির ধরণের লোককে সামনে দিয়ে মসজিদের দিকে যেতে দেখল। জাকির নেসার ফকিরকে দেখেনি। তবে শুনেছে, তিনি মাঝে মাঝে জুম্মার নামায পড়তে মসজিদে আসেন। শত তালি দেয়া আলখেল্লাপরা লোকটার দিকে তাকিয়ে ভাবল, ইনিই বোধ হয় নেসার ফকির। বসে বসে কিছুক্ষণ চিন্তা করল। তারপর কবরস্থানের সেই গাছতলায় গিয়ে বসে রইল। প্রায় ঘণ্টা দেড়েক পর সেই আলখেল্লাপরা লোকটাকে আসতে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল। লোকটা কাছে এলে সালাম দিল।

নেসার ফকির মাটির দিকে তাকিয়ে হাঁটছিল। জাকির সালাম দিতে থমকে দাঁড়িয়ে সালামের উত্তর দিয়ে বড় বড় চোখ বের করে তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন।

জাকির ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল, বড় বড় দু'টো লাল টকটকে চোখ দিয়ে লোকটা তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। জীবনে সে ভয় কাকে বলে জানে না; কিন্তু নেসার ফকিরের দৃষ্টিতে যা দেখল, তাতে ভয় পেল। তবু সাহস করে বলল, আপনি এভাবে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন কেন?

নেসার ফকির দৃষ্টি সংযত করে উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন।

ওঁর হাসির শব্দ জাকিরের কলজে কেঁপে উঠল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে সামলে নিয়ে বলল, আপনি কি নেসার ফকির?

নেসার ফকির হাসি থামিয়ে বললেন, হ্যাঁ, আমি নেসার ফকির। কিন্তু তুমি এই ভরদুপুরে কবরস্থানের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন? জান না; এই জায়গাটা ভালো নয়। তুমি ছেলেমানুষ। তোমার ভয় করে না?

নেসার ফকিরের কথা শুনে জাকিরের সাহস ফিরে এল। বলল, আমি আল্লাহকে ছাড়া কাউকে ভয় করি না।

নেসার ফকির বললেন, তুমিই তা হলে অনেক দিন আগে সাদিয়ার মুখের কাপড় খুলে দিয়েছিলে?

জাকির বলল, জী, ওর মুখ দেখব বলে।

নেসার ফকিরের মুখে মৃদু হাসি ফুঠে উঠল, বললেন, দেখে তোমার কি মনে হল?

কি আবার মনে হবে? দেখতে মন চাইল, তাই দেখলাম। কেন, কোনো অন্যায় করেছি নাকি? ছোট মেয়ের মুখ দেখলে কোনো গোনাহ হয় না।

তা অবশ্য হয় না; কিন্তু তারপর ও তুমি চার, পাঁচ বছর ধরে এখানে এসে তার মুখ দেখেছ এবং তার সঙ্গে কথা বলেছ। আবার গতকাল ও আজ তার সঙ্গে দেখা করার জন্য এসেছ। এটা নিশ্চয় শক্ত গোনাহর কাজ?

এই কথা শুনে জাকির যেমন খুব অবাক হল তেমনি ঘাবড়ে গেল। কোনো উত্তর দিতে পারল না। মাথা নিচু করে চিন্তা করল, ইনি এসব জানলেন কেমন করে? তা হলে কি সাদিয়া বলেছে? তাই বা হয় কি করে? বললে, তো তার আব্বা অনেক আগেই নিষেধ করতেন। তখন তার বুবুর কথা মনে পড়ল, "একটা জীন সব সময় সাদিয়াকে পাহারা দেয়।" কথাটা মনে পড়তে ভাবল, সেই জীন তা হলে ইনাকে বলেছে।

তাকে চুপ করে থাকতে দেখে নেসার ফকির কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে রইলেন। তারপর তার দিকে তাকিয়ে বললেন, আমাকে কিছু বলার জন্য তুমি কি দাঁড়িয়েছিলে?

জাকির কি করে সাদিয়াকে দেখতে পাবে এবং নেসার ফকিরকে সে কথা কিভাবে বলবে ঠিক করতে পারছিল না। এখন ওঁর কথা শুনে বলল, জি, আপনি ঠিক বলেছেন।

আমি তোমার কথা শুনবো; তবে তার আগে তোমাকে ওয়াদা করতে হবে এতদিন তুমি যে সাদিয়ার সঙ্গে দেখা করেছ, আর এখন তোমার আমার মধ্যে যা কথাবার্তা হবে এবং যা কিছু তুমি দেখবে, তা সব চিরকালের জন্য গোপন রাখতে হবে। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত কাউকে বলবে না। বি.এ. পরীক্ষা না হওয়া পর্যন্ত এদিকে আসবে না। এমন কি তোমার বুবুদের বাড়িতেও না। যদি ওয়াদা কর এবং তা পালন কর, তা হলে তোমার মনের বাসনা ইনশা আল্লাহ পূরণ হবে।

জি, আমি ওয়াদা কবুল করলাম।

নেসার ফকিরের ঠোঁটে এক ঝিলিক হাসি ফুটে উঠে মিলিয়ে গেল। তা হলে এস আমার সঙ্গে বলে তিনি হাঁটতে শুরু করলেন। ঘরের উঠোনে এসে একটু বড় গলায় বললেন, জোহরা, কাকে এনেছি দেখবে এস।

সাদিয়ার আম্মার নাম জোহরা। তিনি জোহরের নামায পড়ে সাদিয়াকে কুরআনের তফসীর করে শোনাচ্ছিলেন। স্বামীর কথা শুনে মা মেয়ে এক সঙ্গে ঘরে থেকে বেরিয়ে এলেন। তখন দু'জনের মুখ খোলা ছিল। জোহরা জাকিরকে দেখে ঘোমটা টেনে মুখ ঢেকে ফেললেন। সাদিয়া কিন্তু ঢাকল না।

মুখ ঢাকার আগেই জাকির জোহরার মুখ দেখে চমকে উঠেছে। তারপর সাদিয়ার দিকে অপলক নয়নে তাকিয়ে রইল। তখন তার বাস্তব জ্ঞান লোপ পেল। আর সাদিয়া ও জাকিরের দিকে অপলক নয়নে তাকিয়ে রইল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে সাদিয়ার চোখ থেকে পানি গড়িয়ে পড়তে লাগল।

সবাইয়ের অবস্থা দেখে নেসার ফকির হো হো করে উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন। তারপর হাসি থামিয়ে বললেন, মেহমানের মতো তোমরা ও দেখছি খুব অবাক হয়েছ? যাকগে, মেহমানকে খাওয়াবার ব্যবস্থা কর।

নেসার ফকিরের হাসিতে সবাই বাস্তবে ফিরে এল। ওঁর কথা শুনে মা মেয়ে ভিতরে চলে গেলেন। একটু পরে সাদিয়া একটা খেজুরপাটি এনে বারান্দায় বিছিয়ে দিল।

নেসার ফকির জাকিরকে নিয়ে সেখানে বসলেন।

মিনিট পাঁচেক পরে সাদিয়া প্রথমে পানির জগ, গ্লাস ও চিলিমচি রেখে চলে গেল। তারপর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটা প্লেটে দু'খানা রুটি ও একবাটি ঝোল নিয়ে ফিরে এসে তাদের সামনে রাখল।

আগেই তারা হাত ধুয়েছিল। সাদিয়া রুটি ও ঝোল আনার পর নেসার ফকির জাকিরকে বললেন, নাও, শুরু কর।

রুটি ও ঝোলের দিকে চেয়ে জাকিরের গা ঘিনিয়ে উঠল। রুটীগুলো অপরিস্কার আটা দিয়ে তৈরি। আর বাটীর ঝোল রক্তের মতো টকটকে লাল। খাবে কি না সে চিন্তা করতে লাগল।

নেসার ফকির তার অবস্থা বঝুতে পেরে বললেন, খেতে ইচ্ছা না করলে খেও না; তবে তোমার খাওয়া উচিত। কারণ মেহমানকে অভুক্ত রেখে আমরা তো আর খেতে পারব না।

জাকিরকে কে যেন বলল, তুই নাক চোখ বন্ধ করে হলেও খা। নচেৎ ওঁরাও না খেয়ে থাকবেন।

কথাটা চিন্তা করে জাকির একদম অনিচ্ছা সত্বেও রুটীর এককোন ছিঁড়ে ঝোলে ডুবিয়ে নিশ্বাস বন্ধ করে মুখে দিল।

নেসার ফকির মৃদু হেসে বিসমিল্লাহি ও বারাকাতুল্লাহি বলে খেতে শুরু করলেন। তারপর বললেন, খাওয়ার শুরুতে এটা বলা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। নচেৎ শয়তান খাওয়ার সঙ্গি হয়। এটা হাদিসের কথা।

জাকির কথাটা শুনে লজ্জা পেল। কিন্তু খুব আগ্রহ সহকারে খেতে থাকল। এখন আর খাবারগুলোর প্রতি অনিহা নেই। কারণ প্রথম লোকমা মুখে দিয়ে এমন স্বাদ পেয়েছে, যা সে কল্পনাও করে নি। এত সুস্বাদু খাবার সে জীবনে কোনো দিন খায়নি। তার মনে হল, সে যেন বেহেস্তের খাবার খাচ্ছে? ইচ্ছে করলে অনেক রুটী ও ঝোল খেতে পারবে। হঠাৎ ঘরের দরজার দিকে লক্ষ্য পড়তে দেখতে পেল, দু'জোড়া চোখ তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে। দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে আনমনা হয়ে খেতে লাগল। কয়েক লোকমা খাবার পর তার মনে হল, পেট ভরে গেছে। প্লেটের ও বাটীর দিকে তাকিয়ে দেখল, তারা দু'জনে একটা রুটী খেয়েছে আর বাটীতে এখনও অর্ধেক ঝোল রয়েছে।

খাওয়া শেষ হতে সাদিয়া এসে রুটীর প্লেট ও ঝোলের বাটী নিয়ে চলে গেল।

নেসার ফকির জাকিরকে বললেন, এবার বল কি কথা বলার জন্য দাঁড়িয়েছিলে?

জাকির অকপটে বলল, আমি আপনার মেয়েকে বিয়ে করতে চাই।

নেসার ফকির মৃদু হেসে বললেন, তুমি বি.এ. পরীক্ষার পর তোমার বড় বোনের বাড়ি আসবে। সেই সময় তোমার দুলাভাই গোফরানের কাছে এই কথার উত্তর পাবে। খবরদার আজকের পর থেকে এই দু'বছর তাদের বাড়িতে আসবে না। তারা যদি তোমাদের বাড়িতে গিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করে, তবু তাদেরকে এ ব্যাপারে কিছু বলবে

না। আর যা ওয়াদা করেছ, তা পালন করবে। জেনে রেখ, ওয়াদা ভঙ্গকারীকে আল্লাহ পছন্দ করেন না। এটা ক্বুরআন পাকের কথা।

জাকির এই কথাটা কোনো এক আলেমের মুখে শুনেছিল। নেসার ফকিরের মুখে শুনে হঠাৎ করে তার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, তা আমিও জানি।

নেসার ফকির এক পলক তার মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়ে সাদিয়াকে উদ্দেশ্য করে বলল, এক গ্লাস পানি নিয়ে এসতো মা।

সাদিয়া যখন পানি নিয়ে এল তখন জাকির তার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

আর সাদিয়াও আব্বার হাতে পানির গ্লাস ধরিয়ে দিয়ে জাকিরের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

নেসার ফকির তা দেখেও দেখলেন না। পানি দম করে নিজে এক ঘোঁট খেলেন। তারপর সাদিয়াকে একটা গ্লাস আনতে বললেন।

সাদিয়া গ্লাস নিয়ে এলে তাতে অর্ধেক পানি ঢেলে দিয়ে তাকে এবং বাকি অর্ধেক জাকিরকে খেতে বললেন।

জাকির খেয়ে গ্লাসটা সাদিয়ার হাতে ফেরৎ দিল।

সাদিয়া গ্লাস নিয়ে চলে যাওয়ার পর নেসার ফকির জাকিরকে বললেন, তোমার আব্বা খুব নেকবক্ত লোক ছিলেন। তার ছেলে হয়ে তুমি নামায পড় না কেন? আজ থেকে জামাতের সঙ্গে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বে। হাদিসে আছে, "সমস্ত এবাদতের মধ্যে নামায শ্রেষ্ঠ।" হাদিসে আরও আছে, "নামায বেহেস্তের চাবি।" রমজানের রোযা রাখবে। কোনো কারণেই ফরয নামায ও ফরয রোযা ত্যাগ করবে না। যার তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে না। নামাযী ও চরিত্রবান ছেলের সঙ্গে মেলামেশা করবে। তোমার আম্মার সঙ্গে এতটুকু খারাপ ব্যবহার করবে না। ওঁর সঙ্গে সব সময় নরম মেজাজে কথা বলবে। খুব সাবধান, কোনো কারণেই গরম মেজাজে কথা বলবে না। বড় ভাইকে শ্রদ্ধা করবে। মন দিয়ে পড়াশোনা করবে। যে সমস্ত কথা বললাম তা যদি মেনে চলতে না পার, তা হলে তোমার মনের আশা পূরণ হবে না। বরং ভবিষ্যতে তোমার অনেক ক্ষতি হবে।

জাকির বলল, আপনার কথামতো চলার আপ্রাণ চেষ্টা করব। আপনি দো'য়া করুন, আমি যেন কৃতকার্য্য হতে পারি।

নেসার ফকির বললেন, এবার তুমি যাও। আল্লাহ, তোমাকে কামিয়াব করুক।

জাকির সালাম বিনিময় করে সেখান থেকে বাড়ি চলে গেল। বড় বোনেদের বাড়িতে যাওয়ার কথা তার খেয়াল হল না।

বাড়িতে এসে জাকির নেসার ফকিরের কথামতো সব কিছু করতে লাগল। কিন্তু যখন সাদিয়ার কথা মনে পড়ে তখন খুব আনমনা হয়ে পড়ে। তার কথা রাত্রে বেশি মনে পড়ে। মনে পড়লে তখন আর পড়াতে মন বসাতে পারে না। ঘরের উঠোনে আকাশের দিকে তাকিয়ে সাদিয়ার কথা চিন্তা করে। অনেক রাত পর্যন্ত ঘুমাতে পারে না। এক সময় ক্লান্ত হয়ে গভীর রাতে ঘুমাতে যায়। ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে, সাদিয়া তার কাছে এসে বলছে, "আপনি আমার কথা ভেবে মন খারাপ করবেন না। আমি আপনারই আছি। আপনি মন দিয়ে পড়াশোনা করুন। আর নামাযের পর নিজের মনের কথা জানিয়ে আল্লাহপাকের কাছে দো'য়া চান। আমি বলছি ইনশাআল্লাহ আপনার মনস্কামনা পূরণ হবে। আপনাকে পাওয়ার জন্য আমিও তাঁর কাছে সেই দো'য়া সব সময় করি।" স্বপ্ন দেখার পর তার ঘুম ভেঙ্গে যায়। চোখ মেলে সাদিয়াকে দেখার চেষ্টা করে। দেখতে না পেলেও তার গায়ের আতরের সুগন্ধ পায়, যা সাদিয়ার সঙ্গে দেখা করার সময় পেয়েছে। তখন চোখের পানি ফেলতে ফেলতে ভাবে, নিশ্চয় সাদিয়া এসেছিল। তা না হলে এই সুগন্ধ এল কোথা থেকে। এই স্বপ্ন সে প্রায় দেখে আর ভাবে, সাদিয়ার মাকে অল্পক্ষনের জন্য দেখেছি। তাতেই মনে হয়েছে, সে মানবী নয়, নিশ্চয় পরী। কোনো মানবী এত সুন্দরী হতে পারে না। আর সাদিয়া তার গর্ভে হয়েছে। সেও নিশ্চয় পরী। কারণ পরীর পেটে পরীই হয়। তা না হলে সাদিয়াও তার মায়ের মত সুন্দরী কেন? তার বিবেক বলল, না সে পরী নয়। তা হলে নেসার ফকির কি যাদুকর? যাদুর দ্বারা পরীকে বিয়ে করেছে। তার বিবেক আবার বলল, নেসার ফকির যাদুকর নয়। যদি তাই হত, তা হলে তিনি নামায পড়তেন না। আর তোমাকেও পড়তে বলতে না। এ রকম নানান চিন্তা জাকিরের মাথায় ঘুরপাক খেতে থাকে।

একরাতে জাকির যখন উঠোনে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে ঐসব ভাবছিল তখন তার মা দিলারা খানম প্রস্রাব করতে যাওয়ার সময় জাকিরকে উঠোনে ঐভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বেশ অবাক হলেন। কাছে এসে তার গায়ে হাত দিয়ে বললেন, আকাশের দিকে তাকিয়ে কি দেখছিস বাবা?

জাকির এতক্ষণ বাস্তবে ছিল না। কেউ গায়ে হাত দিয়ে কিছু বলছে শুনে চমকে উঠে বাস্তবে ফিরে এল। ঘুরে মাকে দেখে বলল, কিছু বলছ আম্মা?

দিলারা খানম বললেন, হ্যাঁ, তুই এত রাতে আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছিস কেন?

জাকির একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, সে কথা তোমাকে এখন বলতে পারব না। আল্লাহর যখন মর্জি হবে তখন বলব। তারপর হেসে উঠে বলল, এই দেখ কি বলতে কি বলে ফেললাম। কি আর দেখব? পড়তে পড়তে ঘুম পাচ্ছিল; তাই একটু হাঁটাহাঁটি করতে করতে আকাশের দিকে তাকিয়ে আল্লাহ পাকের কুদরতের কথা চিন্তা করছিলাম। জান আম্মা, আল্লাহ কুরআন মজিদে বলিয়াছেন, "আল্লাহ, যিনি উর্ধ্বদেশে স্থাপন করেছেন আকাশ মন্ডলীকে স্তম্ভ ব্যতীত। তোমরা সেগুলো দেখ। অতঃপর তিনি আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। এবং সূর্য ও চন্দ্রকে কর্মে নিয়োজিত করেছেন। প্রত্যেকে নির্দিষ্ট সময় মোতাবেক আবর্তন করে। তিনি সকল বিষয় পরিচালনা করেন, যাতে তোমরা স্বীয় পালণকর্তার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাসী হও"[১]।

দিলারা খানম জাকিরকে এবারে সমেশপুর থেকে এসে পাঁচ ওয়াক্ত মসজিদে নামায পড়তে যেতে দেখে এবং তার স্বভাব চরিত্রের পরিবর্তন দেখে অবাক হয়েছেন। খুশি হয়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেছেন। আগের সেই দুরন্তপণা স্বভাবও আর নেই। কত ধীর ও নম্র হয়ে গেছে। এখন তার কথা শুনে ভাবলেন, এই ছেলে যখন আল্লাহর সৃষ্টি জগৎ নিয়ে চিন্তা করছে তখন পরে নিশ্চয় আল্লাহপাকের খাস বান্দা হয়ে বনে জঙ্গলে চলে যাবে। এই কথা মনে করে আতঙ্কিত হয়ে বললেন, তুই এখন ছেলেমানুষ। আল্লাহ পাকের কুদরত নিয়ে চিন্তা করিস না। অনেক রাত হয়েছে, যা এবার শুয়ে পড়।

জাকির কিছু না বলে নিজের রুমে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

যেদিন জাকির নেসার ফকিরের বাড়ি থেকে নিজেদের বাড়িতে চলে এল, সেদিন সুফিয়া ও গোফরান তার জন্য খুব চিন্তিত হয়ে পড়ে। পরে একজন চাকরকে এনায়েতপুর পাঠিয়ে জাকিরের খবর জানতে পারে, সে বাড়িতে আছে। তারা ভেবে পেল না, জাকির তাদেরকে না বলে বাড়ি চলে গেল কেন? দু'তিন সপ্তাহ পার হয়ে যাওয়ার পরও যখন জাকির এল না তখন সুফিয়া স্বামীর অনুমতি নিয়ে বাপের বাড়ি এল। জাকির কলেজে গিয়েছিল। কলেজ থেকে ফেরার পর সুফিয়া তাকে জিজ্ঞেস করল, কিরে, সেদিন না বলে চলে এলি যে? এতদিন হয়ে গেল, একবারও গেলি না। কি ব্যাপার বল তো? তোর দুলাভাই কি তোকে কিছু বলেছে?

জাকির বলল, দুলাভাই আবার কি বলবে?

তা হলে আমার শ্বশুর বা শাশুড়ী কিছু বলেছেন?

না বুবু, আমাকে কেউ কিছু বলেনি। তুমি যা ভাবছ, সেসব কিছু নয়। অন্য কারণ আছে। এখন তোমাকে বলতে পারব না।

কি এমন কারণ, যা আমাকে বলতে পারবি না। আমি তোর কোনো কথা শুনব না। হয় তোকে কারণ বলতে হবে নচেৎ আজই আমার সঙ্গে যেতে হবে।

(১) আল-কুরআন-১৩ পারা, সূরা-রাদ, ২নং আয়াত।

বুবু তুমি আমাকে চাপ দিও না। তোমার পায়ে পড়ি বুবু, এ ব্যাপারে আমাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করো না। ইনশা আল্লাহ বি.এ. ফাইন্যাল পরীক্ষার পর সবকিছু জানাব এবং তোমাদের বাড়ি যাব।

তোর সেই পরীক্ষা হতে তো এখনও দেড় দু'বছর বাকি; অতদিন তোকে না দেখে থাকব কি করে? তা ছাড়া আমার শ্বশুর শাশুড়ী তোকে কত ভালবাসেন। তুই সেদিন না বলে চলে আসতে কত চিন্তা করেছেন। যাসনি বলে আমাকে প্রায় বলেন, আমি নাকি তোকে যেতে নিষেধ করেছি। তোর দুলাভাইও কত দুঃখ করে।

জাকির জানে বুবু তাকে ভীষণ ভালবাসে। সময় মতো না গেলে কাঁদে। আর দুলাভাই ও তার মা বাবাও তাকে খুব ভালবাসে। তাদের কথা শুনে জাকিরের চোখে পানি এসে গেল। চোখ মুছে কাতরস্বরে বলল, আমাকে মাফ কর বুবু, আমি এখন কিছু বলতে পারব না। আর তোমার সঙ্গে যেতেও পারব না। এই কথা বলে সে চোখ মুছতে মুছতে সেখানে থেকে বাইরে চলে গেল।

সুফিয়া তার করুণ অবস্থা দেখে চিন্তা করল, কিছুদিন আরও যাক তারপর কারণটা জানা যাবে। দু'তিন দিন থেকে সে স্বামীর বাড়ি ফিরে গেল।

এতদিনেও সুফিয়ার কোনো সন্তান হয়নি। সেজন্যে শ্বশুর-শাশুড়ী ও তাদের আত্মীয় স্বজনের অনেক কটুকথা তাকে শুনতে হয়। শ্বশুর শাশুড়ী ছেলের আবার বিয়ে দিতে চেয়েছেন। কিন্তু গোফরান রাজি হয়নি। বলে, আল্লাপাকের যা ইচ্ছা তাতে সন্তুষ্ট থাকা উচিত। সুফিয়া নিষ্পাপ। ফুলের মতো তার জীবন। আমি পছন্দ করে বিয়ে করেছি। তাকে আমি ভীষণ ভালবাসি। দুনিয়ার কোনো কিছুর বিনিময়ে তার মনে কষ্ট দিতে পারব না।

সুফিয়া স্বামীর কথা শুনে এবং তার প্রতি স্বামীর ভালবাসার কথা জেনে একদিকে যেমন খুব খুশি হয়, অপরদিকে তেমনি সন্তান হয়নি বলে দুঃখে কেঁদে কেঁদে বুক ভাসায়। একদিন স্বামীকে বলল, আমি বাঁজা মেয়ে, তুমি আবার বিয়ে কর। সে হয়তো তোমাকে ছেলেমেয়ে উপহার দিতে পারবে। নচেৎ তোমার বংশ রক্ষা হবে কি করে। এইসব বলার সময় সুফিয়ার চোখ থেকে পানি পড়ছিল।

গোফরান তার চোখের পানি মুছে দিতে দিতে বলল, এরকম কথা আর বলবে না। আল্লাহপাকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি কিছু করতে পারব না। আমি তোমাকে ঢাকায় নিয়ে গিয়ে কোনো ভাল ক্লিনিকে টেষ্ট করাব।

তারপর একদিন সুফিয়াকে ঢাকায় নিয়ে এসে একটা ক্লিনিকে একজন মহিলা গাইনীকে দিয়ে টেষ্ট করাল।

তিনি সবকিছু টেষ্ট করে বললেন, আপনার স্ত্রী বন্ধা নন।

গোফরান জিজ্ঞেস করল, তা হলে সন্তান হচ্ছে না কেন?

ডাক্তার বললেন, কোনো কোনো পুরুষের বীর্যে সন্তান উৎপাদনের হরমন থাকে না। আপনার বীর্য টেস্ট করিয়ে দেখুন।

ডাক্তারের কথা মতো গোফরান বীর্য টেস্ট করাল। জানা গেল, ডাক্তারের কথাই ঠিক। গোফরান এ ব্যাপারটা স্ত্রীকে জানাল না।

এদিকে তার আব্বা আম্মা যখন বারবার বিয়ে করার জন্য চাপ দিতে লাগলেন তখন সুফিয়া স্বামীর পায়ে ধরে কেঁদে কেঁদে বলল, আব্বা আম্মার কথা মেনে নাও। ওঁরা বংশের বাতি দেখে যেতে চান।

গোফরান স্ত্রীকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল, আমি তোমাদের সবাইয়ের দুঃখ বুঝি; কিন্তু একটা কথা ভেবে দেখেছ কি, মেয়েদের মত পুরুষরাও বাঁজা হয়? আমি যদি সেই রকম পুরুষ হই, তা হলে একটা কেন, আরও তিনটি বিয়ে করলেও তাদের পেটে বাচ্চা আসবে না। তা ছাড়া সন্তান হবার বয়স কি পালিয়ে যাচ্ছে? আল্লাহ ইচ্ছা করলে বুড়ো বয়সেও দিতে পারেন।

সুফিয়া চোখ মুখ মুছে বলল, আমার একটা কথা রাখবে?

গোফরান, তাকে আদর দিয়ে বলল, আজ পর্যন্ত তোমার কোন কথাটা রাখিনি বলতে পার? বল কি বলবে?

সুফিয়া বলল, তোমার মুখে শুনেছি নেসার ফকির গ্রামের কারো সাথে যোগাযোগ না রাখলেও তোমার সাথে রাখে। তাকে ধরে তাবিজ-তদ্বির করলে হয় না? আমার মনে হয়, তুমি বললে না করতে পারবে না।

গোফরান নিজের অক্ষমতার কথা জানে। তাবিজ-তদ্বির করলে কোনো ফল হবে না, তাও জানে। তবু স্ত্রীর মন রক্ষার জন্য বলল, তুমি খুব ভালো কথা বলেছ। নেসার ফকিরের সাথে দেখা হলে বলব।

একদিন গোফরান নেসার ফকিরের সঙ্গে দেখা হতে কথাটা বলল।

তার কথা শুনে নেসার ফকির কিছুক্ষণ লাল লাল চোখ বের করে গোফরানের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর দৃষ্টি সংযত করে মৃদু হেসে বললেন, আমি তাবিজ-তদ্বির করি না। তবে একটা কথা বলতে পারি, আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় অনেক বয়সে আপনারা একটা ছেলে পাবেন। এ ব্যাপারে আমাকে আর কোনো দিন কোনো প্রশ্ন করবেন না।

গোফরান আলহামদু লিল্লাহ বলে বলল, ঠিক আছে, আপনাকে আর বিরক্ত করব না। ঘরে ফিরে গোফরান স্ত্রীকে নেসার ফকিরের কথাটা বলল।

সুফিয়া একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, আল্লাহপাকের যা মর্জি।

এবারে সুফিয়াকে বাপের বাড়ি থেকে মন খারাপ করে ফিরে আসতে দেখে গোফরান জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার, জাকির এল না কেন?

সুফিয়া স্বামীকে জাকির যা বলেছে বলল।

গোফরান বলল, এতে মন খারাপ করছ কেন? ধৈর্য্য ধরে দেখ, সে কতদিন না এসে থাকতে পারে। আমার মনে হয়, এর মধ্যে নিশ্চয় এমন কোনো ব্যাপার আছে, যা কারো কাছে বলতে পারছে না। আচ্ছা আম্মাকে কিছু জিজ্ঞেস করেছিলে?

সুফিয়া বলল, হ্যাঁ করেছি। জাকিরের কথা শুনে আম্মা খুব অবাক হয়ে বলল, জানিস সুফিয়া, এবারে তোদের ওখান থেকে এসে জাকিরের আমুল পরিবর্তন হয়েছে। যেমন পড়াশোনায় মন দিয়েছে তেমনি ঠিকমতো নামায পড়ছে। বন্ধুদের সঙ্গে

মেলামেশা ও আড্ডা দেয়া বন্ধ করে দিয়েছে। গভীর রাতে আকাশের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবে।

গোফরান বলল, বললাম না, কিছু একটা ব্যাপার ঘটেছে?

সুফিয়া বলল, তুমি কি কিছু অনুমান করতে পেরেছ?

গোফরান বলল, আমার যতদূর অনুমান, জাকিরের সঙ্গে নেসার ফকিরের যোগাযোগ হয়েছে।

সুফিয়া বেশ অবাক হল। কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে কি যেন ভাবল। তারপর বলল, আমারও তাই মনে হচ্ছে।

এরপর জাকির যখন মাসের পর মাস এল না তখন সুফিয়া ভাবল, স্বামীর কথাই ঠিক।

এরমধ্যে একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে গ্রামের লোকজন নেসার ফকিরকে একজন উচ্চ শ্রেণীর কামেল লোক বলে ধারণা করল। ঘটনাটা হল, এই গ্রামের এক গরিব বুড়ির আঠার উনিশ বছরের নাতি ওমরের বছর দুই আগে কঠিন অসুখ হয়। বুড়ি টাকা পয়সার অভাবে ভালো ডাক্তার দেখাতে পারল না। ঐ নাতি ছাড়া বুড়ির আর কেউ নেই। নাতিটাই রোজগার করে দাদিকে খাওয়াত। নাতি অসুখে পড়তে বুড়ি ভিক্ষে করতে শুরু করল। গ্রামের লোকজন ওমরের অসুখের কথা শুনে কিছু কিছু সাহায্য করল। তাতে বুড়ির পেট চললেও নাতির ভালোমতো চিকিৎসা করাতে পারল না। অনিয়মিত চিকিৎসার ফলে ওমর অনেক দিন ভুগে ভালো হলেও তার দুটো পা চিকন হলে গেল। সে পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে বা হাঁটতে পারে না। হাতে ভর দিয়ে জুম্মার দিন কিছু সাহায্য পাওয়ার আশায় মসজিদের গেটের পাশে এসে বসে। আর মুসুল্লীদের সব জুতো পরিস্কার করে সোজাদিকে ঘুরিয়ে রাখে।

একদিন হরমুজ আলি তাকে বললেন, তুই একদিন নেসার ফকিরের পা জড়িয়ে ধরে তোর পা ভালো করে দেয়ার জন্য বলবি। সবাই তাকে যাই ভাবুক না কেন আমার মনে হয়, তিনি একজন কামেল লোক।

ওমর নেসার ফকিরের কথা শুনেছে। তাকে অনেকবার দেখেছেও। তাকে দেখে তার প্রতি ওমরের ভক্তি হয়নি। তাই হরমুজ আলি ঐ কথা বললেও সে তা করেনি।

একদিন ওমরের দাদি সূরাতন বিবি অন্য গ্রাম থেকে ভিক্ষে করে ফেরার সময় নেসার ফকিরের ঘরের দিকের রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফিরছিল। হঠাৎ তার মনে হল, শুনেছি নেসার ফকির খুব কামেল লোক। ওঁকে ধরে কোনো তদ্বীর-তাবিজ করালে হয়তো ওমরের পা ভালো হয়ে যেত। সেই কথা ভেবে সূরাতন বিবি নেসার ফকিরের ঘরের সামনে গিয়ে বলল, ফকির বাবা আছ নাকি গো?

নেসার ফকির তখন উঠোনের পাশে কিছু তরিতরকারীর গাছ লাগাচ্ছিলেন। এগিয়ে এসে বললেন, হঠাৎ কি মনে করে বুড়ি মা? তারপর সাদিয়াকে ডেকে বললেন, ইনাকে বসতে দাও।

সাদিয়া একটা পাটি পেতে দিতে সূরাতন বিবি বসে বলল, আমি তোমার কাছে একটা দরকারে এসেছি। তারপর ওমরের অসুখের কথা বলে বলল, তুমি বাবা যদি

তাবিজ করে আমার নাতির পা ভালো করে দিতে, তা হলে বড় উপকার হত। ঐ নাতিই আমার একমাত্র সম্বল। সে পঙ্গু হয়ে যাওয়ার পর এই বয়সে ভিক্ষে করে পেট চালাতে হচ্ছে। আল্লাহ তোমার ভালো করবে বাবা, তুমি কিছু একটা ব্যবস্থা করে দাও।

নেসার ফকির বললেন, আমি তো ডাক্তার নই যে, আপনার নাতির পায়ের চিকিৎসা করে ভালো করে দেব। আর তদ্বির-তাবিজের কথা যে বললেন, সে সব আমি করি না। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, আপনি এখন যান, ওমরের পা ভালো করে দেয়ার জন্য আল্লাহ পাকের কাছে দো'য়া করব। আমার উপর মনে কষ্ট নেবেন না। আমি যদি তাবিজ-তদ্বির করতাম, তা হলে নিশ্চয় করে দিতাম।

সুরাতন বিবি বললেন, তুমি যখন ঐসব করো না তখন আর মনে কষ্ট করব কেন? যাই বাবা, তুমি আমার নাতির জন্য দো'য়া করো।

এমন সময় সাদিয়া একগ্লাস ঠাণ্ডা সরবত এনে বলল, দাদি এটা খেয়ে যান।

সুরাতন বিবির পাড়া ঘুরে ঘুরে খুব পিয়াস লেগেছিল। বলল, পানি এনেছ দাও তো খাই, খুব পিয়াস লেগেছে। তারপর সাদিয়ার হাত থেকে গ্লাসটা নিয়ে এক দমে ঢকঢক করে খেয়ে ফেলল।

তাই দেখে নেসার ফকির তাকে পানি খাওয়ার নিয়ম বলে দিলেন।

সুরাতন বিবি মনে করেছিল গ্লাসে পানি আছে। কিন্তু খাওয়ার সময় বুঝতে পারল, পানি নয়, সে যেন সারাবান তহুরা খাচ্ছে। ছেলেবেলায় মুরুব্বিদের মুখে বেহেস্তের সারাবান তহুরার কথা শুনেছিল।

নেসার ফকিরের কথা শুনে বলল, আমি মুখ্য মানুষ বাবা, এসব জানব কি করে? তারপর ফিরে আসার সময় তার মনে হল, ঐ সরবত খেয়ে শুধু পিয়াস নয়, ভুখও মিটে গেছে। নেসার ফকির তাবিজ-তদ্বীর করে দেয়নি বলে তার উপর রেগে গিয়েছিল; কিন্তু সরবত খাওয়ার পর তা দূর হয়ে গেছে।

সুরাতন বিবি ঘরের ভিতর ঘুমায় আর ওমর দরজার সামনে যে একচিলতে বারান্দা আছে, সেখানে ঘুমায়। ঐ দিন গভীর রাতে হঠাৎ ওমরের ঘুম ভেঙ্গে যেতে বুঝতে পারল, কেউ যেন তার চিকন দুপায়ে হাত বোলাচ্ছে। বেশ ভয় পেয়ে প্রথমে চোখ খুলতে সাহস করল না। তারপর সাহস করে চোখ খুলে দেখল, কে যেন তার পায়ের কাছে বসে আছে। অন্ধকার রাত। তাই সে নেসার ফকিরকে চিনতে পারল না। ভয়ে ভয়ে বলল, কে আপনি?

নেসার ফকির দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, তুমি আমাকে চিনতে পারছ না?

এবার ওমর ওকে চিনতে পেরে উঠে বসল। তখন তার হরমুজ আলির কথা মনে পড়ল, "তুই নেসার ফকিরের পা জড়িয়ে ধরে তোর পা ভালো করে দেয়ার জন্য বলবি। লোকে তাকে যাই ভাবুক না কেন, আমি তাকে একজন কামেল লোক বলে জানি।" সেই কথা মনে পড়তে নেসার ফকিরের দুপা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলল, ফকির বাবা, আপনি আমার পা ভালো করে দিন।

নেসার ফকির পা ছাড়িয়ে নিয়ে একটু সরে গিয়ে বললেন, আমি ভালো করার কে? এরকম কথা আর বলবে না। আল্লাহকে জানাও। তিনি ইচ্ছা করলে ভালো করে দিতে পারেন। তারপর তাকে তওবা পড়িয়ে বললেন, তুমি তো খুব ভালো ছেলে। নামায রোযা কর না কেন?

ওমর চোখের পানি ফেলতে ফেলতে বলল, আমি মক্তবে মৌলবীর কাছে নামায ও কুরআন পড়া শিখার পর সব সময় পড়তাম। অসুখে পড়ার পর থেকে আর পড়তে পারি না। অসুখে ভুগে ভুগে পা চিকন হয়ে গেছে। উঠে দাঁড়াতে পারি না।

নেসার ফকির বললেন, তবু তোমার নামায ছাড়া ঠিক হয়নি। জান না নামায না পড়ার কোনো ওজর নেই? দাঁড়িয়ে না পারলে বসে পড়বে। বসে না পারলে পশ্চিম দিকে পা করে শুয়ে দুহাঁটু ভাজ করে চোখের ইশারায় পড়বে। পানি ব্যবহার করতে না পারলে মাটিতে হাত ঘসে তাইমুম করে পড়বে।

ওমর বলল, আমি তো ঐসব জানতাম না। আপনি আমার পা ভালো করে দিন, আমার কেউ নেই ফকির বাবা, কেউ নেই। আপনি দয়া করুন।

নেসার ফকির রেগে উঠে বললেন, তোমাকে এক্ষুনি বললাম না, আল্লাহকে জানাও? তারপরও এই কথা বলছ? সাবধান করে দিচ্ছি, ওরকম কথা আর বলবে না, ওটা শেরেকী কথা।

ওমর কাঁদতে কাঁদতে বলল, আমি মুখ্যু মানুষ, কি বলতে কি বলে ফেলেছি। তারপর তার পা জড়িয়ে ধরতে গেল।

নেসার ফকির তার হাত ধরে বললেন, এবার চল, মসজিদে গিয়ে আল্লাহকে কি বলবে শিখিয়ে দেব।

ওমর বলল, আমি দাঁড়াতে পারি না মসজিদে যাব কি করে?

নেসার ফকির বললেন, ইনশা আল্লাহ পারবে। নাও উঠে দাঁড়াও দেখি বলে ধরা হাতটা জোরে টান দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলেন। তারপর হাতটা ছেড়ে দিয়ে বললেন, চল, অযু করে মসজিদে শোকরানার নামায পড়ে কেঁদে কেঁদে গোনাহ মাফ চাইবে।

ওমর বিশ্বাস করতে পারছে না, সে দাঁড়িয়ে আছে। আজ প্রায় দু আড়াই বছর পঙ্গু হয়েছিল।

নেসার ফকির বললেন, কি হল দাঁড়িয়ে রয়েছে কেন? এস আমার সঙ্গে বলে হাঁটতে আরম্ভ করলেন।

ওমর মন্ত্রমুগ্ধের মতো বেশ সহজেই তার সঙ্গে হেঁটে এসে মসজিদে পুকুরের ঘাট থেকে অজু করে এল।

নেসার ফকির তাকে চুপে চুপে কিছু কথা বলে বললেন, যাও, এবার মসজিদে গিয়ে যা বললাম তাই কর। আর লোকজন জিজ্ঞেস করলে বলবে, স্বপ্নে ওষুধ পেয়ে খেয়ে ভালো হয়েছ। খবরদার, আমার কথা কারো কাছে প্রকাশ করবে না। করলে সারা জীবনের জন্য আবার পঙ্গু হয়ে যাবে।

ওমরের কাছে সবকিছু অবাস্তব মনে হতে লাগল। সে হ্যাঁ না কিছুই বলতে পারল না। নেসার ফকিরের মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। দেখল, অন্ধকারের

মধ্যে তার চোখ দুটো যেন আগুনের মতো জ্বলছে। ভয় পেয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

একটু পরে নেসার ফকিরের গলা শুনতে পেল, দাঁড়িয়ে না থেকে মসজিদে গিয়ে আল্লাহকে ডাক।

ওমর মাথা তুলে নেসার ফকিরকে দেখতে পেল না। অবাক হয়ে এদিকে ওদিক তাকিয়ে তাকে দেখতে না পেয়ে মসজিদের ভিতরে গেল। সে নেসার ফকিরের কথামতো প্রথমে দুরাকায়াত শোকরানার নামায পড়ল। তারপর যা পড়তে বলেছিল, সেই সব পড়ে কেঁদে কেঁদে আল্লাহ পাকের কাছে দো'য়া চাইল। সব শেষে সে যখন মসজিদ থেকে বেরিয়ে এল তখন হরমুজ আলি ও তার পিছন পিছন বেরিয়ে এলেন। বাইরে এসে ওমরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, দাঁড়াও ওমর, যেও না, তোমার সঙ্গে কথা আছে। তিনি আগে থেকে তাহাজ্জুদের নামায পড়ে তসবীহ গুনছিলেন।

ওমর দাঁড়িয়ে পড়ল।

হরমুজ আলি এগিয়ে এসে তার কাঁধে হাত রেখে বললেন, আমি সব কিছু দেখেছি ও শুনেছি। তোমাকে বলেছিলাম না, নেসার ফকির ফকিরের মতো থাকলেও কামেল লোক? এখন তার প্রমাণ পেলে তো? তবে খুব সাবধান, ওঁর কথা কারো কাছে প্রকাশ করো না। উনি সবাইকে যা বলতে বললেন, তাই বলবে।

ওমর হরমুজ আলির দুহাত জড়িয়ে ধরে বলল, তা তো নিশ্চয়। তারপর ভিজে গলায় বলল, দাদা, আমার এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না, আমি চলাফেরা করতে পারছি। খুব ভয়ও করছে।

হরমুজ আলি বললেন, ভয় কি? আল্লাহ তোর সহায় আছেন। তা না হলে নেসার ফকির নিজে কেন তোর কাছে এসেছিলেন। এবার ঘরে যা। আমি মসজিদে থাকব।

ওমর ঘরের দিকে হাঁটতে লাগল।

নেসার ফকির যখন ঘরে এসে ওমরের সাথে কথা বলছিলেন তখন সুরাতন বিবির ঘুম ভেঙ্গে যায়। উঠে এসে দরজায় কান ঠেকিয়ে তাদের কথাবার্তা শুনে বুঝতে পারল, নেসার ফকির এসেছে। তারপর তারা যখন মসজিদের দিকে চলে গেল তখন বাইরে এসে দেখল, নেসার ফকিরের পিছনে পিছনে ওমর হেঁটে যাচ্ছে। দেখে অবাক হয়ে বলল, আল্লাহ তোমার হাজার হাজার শোকর। সেই থেকে ওমরের ফিরে আসার অপেক্ষায় তারই বিছানায় বসে রইল।

ওমর ফিরে এসে দাদিকে দেখে জড়িয়ে ধরে চোখের পানি ফেলতে ফেলতে বলল, দাদি, আল্লাহ আমার পা ভালো করে দিয়েছে।

সুরাতন বিবির চোখেও পানি এসে গেল। ভিজে গলায় বলল, সবই আল্লাহর ইচ্ছা। এতক্ষণে বুঝলাম, নেসার ফকির কেন আমাকে মনে কষ্ট করতে নিষেধ করেছিল।

ওমর বলল, তুমি তার কাছে কবে গিয়েছিলে?

সুরাতন বিবি সব কিছু খুলে বলে বলল, নেসার ফকির খুব কামেল লোক। আল্লাহ তার ভালো করুক।

ওমর দাদিকে নেসার ফকির যে সব কথা বলে দিয়েছিলেন তা সব বলে বলল, তুমি যেন কারও কাছে তার কথা বলেন। বললে আমি আবার পঙ্গু হয়ে যাব।

সুরাতন বিবি বললেন, না ভাই বলব না। বুড়ি হয়ে গেছি বলে কি এটুকু বুদ্ধিও নেই মনে করেছিস?

পরের দিন ফজরের সময় ওমরকে নামায পড়তে দেখে এবং তার পা ভালো হয়ে গেছে দেখে সবাই ছেঁকে ধরল। জিজ্ঞেস করল, রাতের মধ্যেই এরকম হল কি করে। একজন বলে উঠল, কাল ওকে আমি হাতে ভর দিয়ে যেতে দেখলাম।

ওমর বুদ্ধি খাটিয়ে বলল, স্বপ্নে দেখলাম, একজন ফকির এসে ভিক্ষে চাচ্ছে। আমি আমার পায়ের কথা বলে বললাম, আমার কেউ নেই। কেবল দাদি আছে। সে আপনার মতো ভিক্ষে করতে গেছে। আমার কথা শুনে ফরিকটা কাছে এসে তার ঝোলা থেকে কি একটা জিনিস বের করে আমাকে খাইয়ে দিয়ে বলল, যা বেটা, তোর পা ভালো হয়ে গেছে। এবার থেকে তুই হাঁটা চলা করতে পারবি। তারপর ঠিকমতো নামায রোযা করতে বলে চলে গেল। ঘুম ভেঙ্গে যেতে আযান শুনতে পেলাম। সেই সময় স্বপ্নের কথা মনে পড়ল। নামায পড়ব বলে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে দেখি, কোনো অসুবিধে হচ্ছে না। তখন নামায পড়ার জন্য চলে এলাম।

কথাটা অনেকে বিশ্বাস করল না। আবার অনেকে করল। কেউ কেউ বলল, তোর দাদি খুব ভাগ্যবতী। তার কষ্ট দূর করার জন্য আল্লাহ তোকে ভালো করে দিল। সেখানে কেরামত আলি নামে একজন মুরুব্বি ছিলেন। তিনি গতকাল গভীর রাতে প্রকৃতির ডাকে বদনা হাতে করে বেরিয়েছিলেন। দু'জন লোককে মসজিদ তলায় কথা বলতে শুনে চোর মনে করে চুপে চুপে এসে মসজিদের আড়ালে দাঁড়ালেন। তারপর তাদের কথা শুনে এবং নেসার ফকিরের আগুনের ভাটার মতো চোখ দেখে হুশ হারিয়ে ফেলেছিলেন। ওঁর যখন হুশ হল তখন নেসার ফকিরকে দেখেতে পেল না। তবে ওমরকে মসর্জিদে ঢুকতে দেখেছেন। ভয়ে তখন ওঁর পায়খানা শুটকে গেছে। তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে আসেন। তিনি এখন ওমরের কথা শুনে বললেন, ওমর তুই মিথ্যে কথা বলিস। স্বপ্নে ফকির তোকে ওষুধ খাইয়ে ভালো করেছে, না নেসার ফকির তোকে ভালো করেছে? আমি গভীর রাতে তোকে ও নেসার ফকিরকে এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলতে দেখছি।

ওমর কেরামত আলিকেও দাদা বলে ডাকে। বলল, দাদা, আপনি কি বলছেন কিছু বুঝতে পারছি না। আমি তো পঙ্গু ছিলাম, কি করে এখানে আসব? সত্যি দাদা, মনে হচ্ছে ইদানিং আবার আপনার মাথার গোলমাল একটু বেড়েছে। বছর খানেক আগে কেরামত আলি প্রথমে টাইফয়েড এবং পরে কালাজ্বরে অনেক দিন ভুগে তার মাথায় একটু গলোমাল দেখা দিয়েছে। মাঝে মাঝে আজেবাজে কথা বলেন। কেউ কিছু বললে বেছুট বকতে থাকেন। গ্রামের সবাই ব্যাপারটা জানে।

কেরামত আলি ওমরের কথা শুনে বললেন, তোরা আমাকে যা কিছু বলিস না কেন, আমি কিন্তু তোদের দু'জনকে ঠিকই দেখেছি।

লোকজন তার কথায় গুরুত্ব না দিয়ে যে যার চলে গেল। তবু আসল ঘটনা কেমন করে যেন গ্রামময় ছড়িয়ে পড়ে। তারপর থেকে সবাই নেসার ফকিরকে একজন বোজর্গ লোক বলে ভাবে।

নেসার ফকির গ্রামের কারো সঙ্গে যোগাযোগ না রাখলেও গোফরানের সাথে রাখেন। দেখা হলেই সালাম বিনিময় করে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলেন। ব্যাপারটা যখন অনেকের কাছে ধরা পড়ল তখন একদিন তারা গোফরানকে জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার? গ্রামে এত লোক থাকতে নেসার ফকির শুধু তোমার সঙ্গে আলাপ করে? কি এমন আলাপ করেন আমাদের বলবে?

গোফরান হেসে উঠে বলল, তেমন কিছুই না। শুধু সালাম বিনিময় করে ভালোমন্দ জিজ্ঞেস করেন।

হরমুজ আলি কথাটা জেনে ভাবলেন, এরমধ্যে নিশ্চয় কোনো রহস্য আছে। একদিন তিনি গোফরানকে একাকি জিজ্ঞেস করলেন, নেসার ফকিরকে তোমার কি রকম লোক বলে মনে হয়? আর সে তোমার সঙ্গে কি কথাই বা বলে?

গোফরান বলল, আপনি তো জানেন আমি কখনও মিথ্যা বলি না; কিন্তু গ্রামের লোকজন একদিন আপনার মতো আমাকে প্রশ্ন করেছিল, তখন নেসার ফকিরের কথামতো মিথ্যা বলেছি। তবে আপনার কাছে তা বলব না। নেসার ফকিরকে যতটুকু জেনেছি তাতে করে মনে হয় আপনারা তাকে যা ভাবেন তিনি তাই। আর আমার সঙ্গে যে সব কথা বলেন, তা তিনি কাউকে বলতে নিষেধ করেছেন। তাই বলতে পারছি না। সেজন্যে মাফ চাইছি।

হরমুজ আলি বললেন, তোমাকে মাফ চাইতে হবে না। তোমার মুখে যতটুকু জানালাম, ততটুকুই যথেষ্ট। তারপর মুচকি হেসে বললেন, তুমি যে এই কথা বলবে, তা আমি আগেই অনুমান করেছিলাম। ঠিক আছে, এবার তুমি যাও।

জাকির আজ দু'বছর হতে চলল সমেশপুর আসেনি। এই দু'বছর মন দিয়ে পড়াশোনা করেছে। তার এখন ফাইন্যাল পরীক্ষা চলছে।

যেদিন জাকিরের পরীক্ষা শেষ হবে তার আগের দিন রাত বারটার পর গোফরান ঘর থেকে বেরোবার সময় স্ত্রীর কাছে ধরা পড়ে গেল। সে মনে করেছিল সুফিয়া অনেক আগে ঘুমিয়ে পড়েছে। তাই নিশ্চিন্ত হয়ে আলনা থেকে জামা নিয়ে গায়ে দিচ্ছিল। এমন সময় স্ত্রীর কণ্ঠস্বর কানে এল, এত রাতে কোথায় যাবে?

আজ জুম্মার নামাযের পর থেকে সুফিয়া স্বামীর মনের অস্থিরতা লক্ষ্য করেছে। কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করেনি। ভেবেছিল, সে নিজেই বলবে। এশার নামাযের পর যখন খেতে দিল তখন সেই অস্থিরতা আরও বেশি বলে সুফিয়ার মনে হল। ঘুমাবার সময় থাকতে না পেরে জিজ্ঞেস করল, আজ তোমার কি হয়েছে বলতো? মনে হচ্ছে জুম্মার নামাযের পর থেকে যেন কিছু ভাবছ?

গোফরান বলল, হ্যাঁ ভাবছি। তবে তোমাকে এখন বলতে পারছি না; পরে বলব।

স্বামীর কথা শুনে সুফিয়া জিদ করল না। তাকে এপাশ ওপাশ করতে দেখে ভাবল, সে এমন গুরুতর কিছু ভাবছে, যে জন্যে তার ঘুম আসছে না। সুফিয়াও জেগে রইল। তারপর ভারি রাতে স্বামীকে উঠে জামা গায়ে দিতে দেখে এই কথা বলল।

গোফরান সুফিয়ার কথায় চমকে উঠল। বলল, তুমি এখনও ঘুমাওনি?

সুফিয়া বলল, তুমি ঘুমাওনি বলে আমিও ঘুমাতে পারিনি। কোথায় যাবে বলবে না?

গোফরান বলল, তুমি ঘুমিয়ে পড়। আমি কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরে আসব। কথা শেষ করে সুফিয়া বাধা দেয়ার আগেই বেরিয়ে গেল।

সুফিয়া স্বামীর নাড়ী নক্ষত্র জানে। ভাবল, নিশ্চয় কোনো জরুরী দারকারে কারও সঙ্গে গোপনে দেখা করতে গেল। কিন্তু এতরাতে একা যাওয়া কি ঠিক হল? কোনো উপায় না দেখে ফেরার অপেক্ষায় জেগে রইল।

জুম্মার নামাযের সময় নেসার ফকির গোফরানকে রাত বারটার পর মসজিদ তলায় আসতে বলেছিলেন। এত রাতে কেন আসতে বললেন, সেই কথা ভেবে গোফরান মনের মধ্যে অস্থিরতা অনুভব করে। সেটা তার স্ত্রীর চোখেও ধরা পড়েছে।

গোফরান মসজিদ তলায় এসে নেসার ফকিরকে দেখে সালাম দিল।

নেসার ফকির সালামের উত্তর দিয়ে বললেন, এসেছেন? আপনার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। কয়েকটা গোপনীয় কথা বলব বলে ডেকেছি। আপনার ছোটশালা জাকির, আমার মেয়ে সাদিয়াকে বিয়ে করতে চায়। এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি?

গোফরান কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আমার মতামতে কোনো কাজ হবে না। ওর মা, বড়ভাই রয়েছেন। তাদের মতামতই হল আসল। তা ছাড়া ও এখন ছেলে মানুষ। পড়াশোনা করছে।

নেসার ফকির বললেন, ওঁরা যে মত দেবেন না তা আমি নিশ্চিত। আমি তাদের মতামতের কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করিনি, করেছি আপনার।

গোফরান ও নেসার ফকিরকে একজন বোজর্গ লোক বলে মনে করে। সেই জন্য তাকে খুব ভক্তি শ্রদ্ধা করে। বলল, দেখুন আপনি যখন জাকিরকে জামাই করতে চাচ্ছেন তখন আমি খুশি মনে মত দেব। কিছু মনে করবেন না, বেয়াদবি হলে মাফ করে দেবেন। জাকির তো প্রায় দু'বছর হয়ে গেল এদিকে আসেনি। আপনি জানলেন কেমন করে, সে সাদিয়াকে বিয়ে করতে চায়?

নেসার ফকির বললেন, সে দু'বছর আগে আমাদের বাড়িতে গিয়েছিল। সেই সময় কথাটা বলেছিল। তাকে দেখে ও তার কথা শুনে আমার মনে হয়েছে, সে সাদিয়ার উপযুক্ত। আর সাদিয়াও তার উপযুক্ত। তাই তাকে আমি বি.এ. পরীক্ষার আগে এই গ্রামে আসতে নিষেধ করেছিলাম এবং কিছু উপদেশ দিয়ে সেগুলো মেনে চলতে বলেছিলাম। সে রাজি হয়ে চলে যায়। আমি খোঁজ নিয়ে দেখেছি, সে আমার সব উপদেশ মেনে চলছে। গোফরান কিছু বলতে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, আপনি যা বলতে চাচ্ছেন, তা আমি জানি। এখন আমি যা বলব, তা মেনে নেবেন কিনা বলুন?

গোফরান বলল, বলুন কি বলবেন। নিশ্চয় তা মেনে নেব।

নেসার ফকির বললেন, জাকির হয়তো কাল আসবে। আমি তার সঙ্গে দু'এক দিনের মধ্যে সাদিয়ার বিয়ে দেব। বিয়ের পর খুব সম্ভব তার মা ও বড় ভাই সাদিয়াকে ঘরে তুলবে না। জাকিরকেও খুব রাগারাগি করতে পারে। আপনি ওদের দু'জনকে কিছুদিন আপনাদের কাছে রাখবেন। এর ফলে আপনার শ্বাশুড়ী ও বড় শালার সঙ্গে আপনাদের বেশ মনোমালিন্য হতে পারে। চিন্তা করবেন না, কিছুদিনের মধ্যে সব ঠিক হয়ে যাবে।

গোফরান বলল, সে যাই হোক; আমি আপনার কথামতো সবকিছু করব।

নেসার ফকির আলহামদুলিল্লাহ বলে সালাম বিনিময় করে গোফরানকে বাড়ি যেতে বলে চলে গেলেন।

স্বামী ফিরে এলে সুফিয়া আতঙ্কিত স্বরে বলল, কোথায় গিয়েছিলে এখন আর বলতে কোনো বাধা নেই নিশ্চয়?

গোফরান তার পাশে বসে নেসার ফকির যা বলেছেন, তা সব বলল।

সুফিয়া শুনে খুব অবাক হয়ে বলল, এখন বুঝতে পারলাম জাকির এতদিন কেন আমাদের বাড়ি আসেনি।

গোফরান বলল, আমিও। কিন্তু আমি যে নেসার ফকিরকে বললাম, তার সব কাজের দায়িত্ব নিলাম, তার কি হবে বলতো?

কথা যখন দিয়েছ তখন তা পালন করতেই হবে। এখানকার কেউ বাধা দেবে বলে মনে হয় না। তবে আম্মা ও খলিল জেনে আমাদের উপর যেমন রেগে যাবে তেমনি মনে কষ্ট পাবে।

নেসার ফকির সে কথা আমাকে বলেছেন। আরও বলেছেন, কিছু দিনের মধ্যে সব ঠিক হয়ে যাবে। আমার কি মনে হয় জান? নেসার ফকির খুব আল্লাহওয়ালা লোক। তিনি যখন জাকিরকে জামাই করতে চাচ্ছেন তখন জাকিরের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল। তোমার কি মনে হয়?

আমি তোমার সঙ্গে একমত। শুধু একটা খটকা লাগছে, জাকির এখনও বিয়ের উপযুক্ত হয়নি।

আমি সে কথা ওঁকে বলেছিলাম। শুনে বললেন, সাদিয়াও ছোট। ইনশাআল্লাহ কোনো অসুবিধে হবে না।

ওঁর কথা যা শুনেছি, তাতে করে আমার মনে হয়, উনি আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অধিকারী। সেই জ্ঞানের দ্বারা আল্লাহপাক ওঁকে অনেক অজানা জিনিস জানিয়ে থাকেন। এখন ওসব কথা থাক। রাত আর বেশি নেই। তাহাজ্জুদের নামায পড়ে একটু ঘুমিয়ে নাও। আল্লাহর যা ইচ্ছা তাই হবে।

গোফরান বলল, তুমি ঠিক কথাই বলেছ। ভাবছি, কথাটা আব্বা আম্মাকে জানাব কি না।

সুফিয়া বলল, অবশ্যই জানাতে হবে।

পরের দিন সকালে গোফরান আব্বা আম্মাকে নেসার ফকিরের কথা জানাল।

আয়মন বিবি অবাক হয়ে চুপ করে রইলেন।

ইয়াসির মিয়া বললেন, আমি নেসার ফকিরের সাথে কয়েকবার কথা বলেছি। তাতে মনে হয়েছে তিনি সাধারণ মানুষ নন। ওঁর মধ্যে আল্লাহ প্রদত্ত কিছু এলেম আছে। তিনি যখন এই কাজ করতে চাচ্ছেন তখন আমি অমত করব না। তুমি তার কথামতো কাজ কর।

ঐদিন সন্ধ্যার সময় জাকির সুফিয়াদের বাড়িতে এসে পৌঁছাল।

গোফরান নেসার ফকিরের কথামতো সারাদিন তার অপেক্ষায় ছিল। সন্ধ্যে হয়ে এলেও যখন জাকির এল না তখন ভাবল, হয়তো কাল আসবে। এই কথা মনে করে মাগরিবের নামায পড়ার জন্য মসজিদ পুকুরঘাটে অযু করছিল।

এমন সময় জাকির সেখান থেকে আসার পথে দুলাভাইকে দেখতে পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। গোফরান অযু করে ঘাটের উপরে এলে জাকির সালাম দিয়ে বলল, দুলাভাই কেমন আছেন?

গোফরান সালামের উত্তর দিয়ে বলল, ভালো আছি। তা তোমাদের বাড়ির খবর সব ভালো?

জাকির বলল, হ্যাঁ সব ভালো।

আযান হতে শুনে গোফরান বলল, আগে নামায পড়বে, না ঘরে গিয়ে বুবুকে দেখা দিয়ে এসে পড়বে?

জাকির বলল, নামায পড়ে একসঙ্গে যাব।

গোফরান বলল, তা হলে তুমি অযু করে এস, আমি এগোই। তারপর মসজিদে যাওয়ার সময় ভাবল, নেসার ফকিরের কথাই ঠিক হল।

নামাযের পর স্বামীর সঙ্গে জাকিরকে আসতে দেখে সুফিয়া তাকে উদ্দেশ্য করে বলল, কিরে, দু'বছর পর হঠাৎ এলি যে?

জাকির সালাম দিয়ে প্রথমে দুলাভাইকে ও পরে বুবুকে কদমবুসি করে বলল, তোমাকে তো বলেছিলাম, পরীক্ষা দিয়ে আসব। আজ দুপুরে পরীক্ষা শেষ হয়েছে। তাই তো চলে এলাম।

সুফিয়া সবকিছু জেনেও না জানার ভান করে ঐ কথা বলেছিল। তার কথা শুনে মৃদু হেসে বলল, আয় বস। তারপর জিজ্ঞেস করল, আম্মাও ঘরের সবাই ভালো আছে?

জাকির বলল, হ্যাঁ আল্লাহ'র রহমতে সবাই ভালো আছে।

রাতে খাওয়া দাওয়ার পর গোফরান জাকিরকে বলল, তুমি শালা বড় ডেঞ্জারেস ছেলে। তোমার সাহসের বলিহারি, তুমি কিনা নেসার ফকিরের ঘরে গিয়েছিলে?

জাকির অবাক হয়ে বলল, আপনি জানলেন কেমন করে?

গোফরান বলল, শুধু তাই নয়, তার মেয়েকে যে বিয়েও করতে চাও, সেকথাও জানি।

জাকির আরও অবাক হয়ে বলল, নেসার ফকিরের বাড়িতে গিয়েছিলাম, কেউ হয়তো দেখে থাকবে; কিন্তু ওঁর মেয়েকে বিয়ে করতে চাই, একথা তো কাউকে বলিনি?

গোফরান বলল, বলনি তো কি হয়েছে? এসব কথা কি গোপন থাকে? এখন বল দেখি, সাদিয়াকে বিয়ে করতে চাও কিনা? যদি চাও, তা হলে ব্যবস্থা করতে পারি।

জাকির বুঝতে পারল, নেসার ফকির নিশ্চয় দুলাভাইকে বলেছেন। নচেৎ জানলেন কেমন করে? কোনো কথা না বলে চুপ করে রইল।

তাকে চুপ করে থাকতে দেখে গোফরান বলল, কি হে, চুপ করে রয়েছে কেন? আমার কথা কি শুনতে পাওনি?

জাকির বুবুর সামনে বিয়ের কথা শুনে লজ্জা পেয়েছে। কি বলবে মাথা নিচু করে ভাবতে লাগল।

সুফিয়া ছোট ভাইকে লজ্জা থেকে বাঁচাবার জন্য বলল, ওকি আর মুখ ফুটে কিছু বলবে নাকি? নেসার ফকির তোমাকে যা করতে বলেছেন, তার ব্যবস্থা কর।

পরের দিন সকালে নেসার ফকির গোফরানের কাছে এসে একদিন পর সোমবার জোহরের নামাযের পর মসজিদে বিয়ে পড়ানর কথা বলে গেলেন।

গোফরান গ্রামের লোকজনদের জাকির ও সাদিয়ার বিয়ের কথা বলে মসজিদে জোহরের নামাযের পর আসতে বলল।

সবাই অবাক হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করল, কি করে এরকম হল।

গোফরান বলল, নেসার ফকির একদিন জাকিরকে জামাই করার কথা আমাকে বললেন। আমি ভালো মনে করে রাজি হয়ে গেলাম।

সোমবার দিন জোহরের নামাযের পর গ্রামের লোকের উপস্থিতিতে বিয়ের কাজ মিটে গেল। এশার নামাযের পর নেসার ফকির মেয়েকে গোফরানদের বাড়িতে নিজে দিয়ে গেলেন।

বাড়ির মেয়েরা সাদিয়ার রূপ দেখে ভীষণ অবাক হয়ে বলাবলি করতে লাগল, সাদিয়া মানবী নয়। কোনো মানবী এত রূপসী হয় না।

সুফিয়া সাদিয়াকে দেখে নিজেও তাই মনে করল। ভাবল, একে খুব সাবধানে রাখতে হবে।

গ্রামের সব মেয়ে পুরুষ মনে করত নেসার ফকির পরীকে বিয়ে করেছে। সেই জন্যে সে সমাজে বাস করে না। আর তার স্ত্রীও কারো বাড়ি যায় না। কোনো মেয়েকে মুখ পর্যন্ত দেখায় না। এখন সাদিয়াকে দেখে তাদের সেই ধারণা আরও দৃঢ় হল। বলাবলি করতে লাগল, পরীর মেয়ে পরীর মতো দেখতে হয়েছে।

গোফরানের চাচাতো ভাইয়ের মেয়েরা বাসর ঘর সাজিয়ে সাদিয়াকে সেখানে রেখে জাকিরের কাছে এস বলল, চল মামা ওঘরে চল।

জাকির বুবুর ঘরে দুলাভাইয়ের সঙ্গে কথা বলছিল। গোফরান তাকে বিয়ের পর কি ঘটবে না ঘটবে নেসার ফকির যা বলেছিল, সে কথা বলছিল। সুফিয়াও সেখানে ছিল। সে স্বামীকে উদ্দেশ্য করে বলল, এসব কথা এখন থাক। তারপর জাকিরকে বলল, তুই ওদের সাথে যা।

জাকির একবার দুলাভাইয়ের দিকে চেয়ে গুটি গুটি পায়ে তাদের সঙ্গে এগোল। মেয়েরা তাকে বাসর ঘরে নিয়ে এসে ফিরে যাওয়ার সময় একটা মেয়ে বলল, মামা, মামীর সঙ্গে খুব সাবধানে আচার-ব্যাবহার করবেন। কারণ মামীমা মানবী নয়। তারপর তারা হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল।

জাকির দরজা লাগিয়ে খাটের দিকে তাকিয়ে দেখল, সবুজ ঘাগরা ও কামিজ পরা এবং ওড়না ঢাকা সাদিয়া মাথা নিচু করে বসে আছে। জাকির সালাম দিয়ে খাটের কাছে এগিয়ে এসে বলল, সাদিয়া মুখ তুলে আমার দিকে তাকাও। তোমাকে দেখার জন্য দু'বছর ধরে পাগল হয়ে আছি।

সাদিয়া মুখের ঘোমটা না সরিয়ে মাথা তুলে সালামের উত্তর দিল। তারপর খাট থেকে নেমে কদমবুসি করে উঠে দাঁড়াল।

জাকির তার ঘোমটা সরিয়ে খুব অবাক হয়ে বাকশক্তি হারিয়ে ফেলল। দু'বছর আগের রূপসী সাদিয়া আরও এতবেশি রূপসী হয়েছে, যা দেখে তার মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হল। তাড়াতাড়ি সাদিয়াকে ধরে টাল সামলাল। তারপর জড়িয়ে ধরে বিস্ময়ে অবিভূত হয়ে হতবাক হয়ে গেল। কোনো মেয়ের শরীর যে এত নরম, তা কল্পনা করতে পারল না। কিছুক্ষণ স্থির হয়ে থেকে তাকে পাগলের মতো চুমো খেতে লাগল।

সাদিয়া নিজেকে স্বামীর হাতে সম্পূর্ণরূপে সমর্পন করে দিল।

একসময় জাকির চুমো খাওয়া বন্ধ করে দু'হাতে সাদিয়ার লজ্জারাঙ্গা মুখ ধরে বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, সেই আল্লাহপাকের দরবারে কোটি কোটি শুকরিয়া জানাই, যিনি বেহেস্তের হুরসম তাঁর এই বান্দীকে আমার জন্য কবুল করেছেন। তারপর ঠোঁটে ঠোঁট রেখে ডাকল, সাদিয়া?

সাদিয়া এতক্ষণ স্বামীর আচরণে লজ্জারাঙ্গা হয়ে চোখ বন্ধ করে নিশ্চুপ হয়েছিল। স্বামীর ডাকে সেই অবস্থাতেই বলল, জী বলুন।

আমাকে কি তোমার পছন্দ হয়নি?

সাদিয়া চমকে উঠে কম্পিত পাপড়ী মেলে আঁশুভরা চোখে বলল, এমন কথা আপনি বলতে পারলেন? কবরস্থানের সেই দিনগুলোর কথা কি আপনার মনে নেই। পনের দিন অন্তর আপনি আসতেন। সেই পনের দিন যে কি করে কাটাতাম তা আপনিও তো কিছুটা জানতেন। তারপর এই দীর্ঘ দু'বছর আল্লাহপাকের কাছে আপনাকে স্বামী হিসাবে পাওয়ার জন্য ফরিয়াদ করেছি। তিনি আমার ফরিয়াদ কবুল করে ধন্য করেছেন। সেজন্যে তাঁর পাক দরবারে শতকোটি শুকরিয়া জানাচ্ছি। এই দু'বছর আপনাকে দেখার জন্য আমিও পাগল হয়েছিলাম।

তা হলে চোখ বন্ধ করে ছিলে কেন?

সাদিয়া স্বামীর মুখ ধরে আদরে আদরে ভরিয়ে দিয়ে বলল, আমার মনে হচ্ছিল, স্বপ্ন দেখছি। তাকালে স্বপ্ন যদি ভেঙ্গে যায়, তাই চোখ বন্ধ করে ছিলাম।

জাকির তাকে বুকে চেপে ধরে বলল, আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় এটা স্বপ্ন নয় বাস্তব। তারপর তাকে পাশে বসিয়ে বলল, কয়েকটা কথা বলছি শোন, আমি তোমাকে বিয়ে করেছি, তা আমাদের বাড়ির কেউ জানে না। আর.....।

সাদিয়া তার মুখে হাত চাপা দিয়ে বলল, আর কিছু বলতে হবে না। আব্বা আমাকে আপনার ও আপনাদের বাড়ির সবকিছু জানিয়েছেন। আপনাকে বলতে বলেছেন, বিয়ের পর হয়তো বেশ গোলমাল হবে। তখন আমাকে ও আপনাকে ধৈর্য্য ধরতে। আমাদেরকে কোনো দুশ্চিন্তা করতেও নিষেধ করেছেন।

জাকির বেশ অবাক হয়ে বলল, আল্লাহ অনেক বড় দুশ্চিন্তা থেকে বাঁচালেন। আচ্ছা, তুমি আমাকে আপনি করে বলছ কেন? তুমি করে বল।

সাদিয়া তার দুটো হাত ধরে বলল, মাফ করবেন। আব্বা আম্মা আমাকে যে শিক্ষা দিয়েছেন, তা কখনই লঙ্ঘন করতে পারব না। আম্মাও আব্বাকে আপনি করে বলেন।

তা না হয় বুঝলাম; কিন্তু একটা জিনিস কিছুতেই বুঝতে পারছি না, তোমার আম্মা কোনো মেয়েলোকের কাছেও মুখ খোলেন না কেন? ইসলামে এটা তো নিষেধ নেই।

তা আমিও জানি। সে কথা আম্মাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। বললেন, তোর আব্বার হুকুম। তারপর আমাকে বললেন, তুইও সব সময় আমার মতো পোশাক পরে থাকবি।

আম্মা না বললেও আমি তোমাকে তাই বলতাম। কারণ আল্লাহ তোমাকে এত রূপসী করে পয়দা করেছেন যে, তোমাকে দেখে কেউ মানবী বলে বিশ্বাস করবে না।

আল্লাহপাক জানেন আমি কতটা রূপসী। কিন্তু আপনিও কম নন। আমার কাছে আপনি পৃথিবীর সব মানুষের থেকে বেশি সুন্দর।

জাকির হেসে ফেলে বলল, তুমি আমাকে যা বললে তা আমি নই। তবে একথা স্বীকার করছি, শুধু তোমার কাছে তাই।

এভাবে দু'টি তরুণ প্রেমিক প্রেমিকা দীর্ঘ বিরহের পর মিলনের আনন্দে বিভোর হয়ে সারারাত প্রেমালাপ করে কাটাল।

এখানে এক সপ্তাহ থেকে জাকির বাড়িতে গিয়ে মাকে বড়ভাই ও ভাবির সামনে বলল, বুবু ও দুলাভাই নেসার ফকিরের মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ে দিয়েছে।

শুনে দিলারা খানম মেয়ে জামাইয়ের উপর খুব রেগে গেলেন। বললেন, নেসার ফকিরের বাপ দাদার কোনো ঠিক ঠিকানা নেই। শুনেছি জীন পরীদের সাথে থাকে। তার বৌ পরী। সবাই সে কথা জানে। আর তুইও তো সে কথা জানিস। তবু তুই তার মেয়েকে বিয়ে করলি কেন? আর তোর বুন বোনাই জেনেশুনে এমন কাজ করল কি করে? আমাদেরকে একবার জিজ্ঞেসও করল না? পরীর পেটের মেয়ে ঘরে এনে বিপদ ডাকব নাকি? না না, তুই সে মেয়েকে ছেড়ে দে। তুই এখন ছেলেমানুষ। মেয়ে জামাইয়ের আক্কেল বা কি? আমাদের না জানিয়ে তোর বিয়ে দিয়ে দিল? তারপর বড় ছেলে খলিলকে বললেন, তুই আজই জাকিরকে সাথে নিয়ে সমেশপুরে সুফিয়াদের বাড়িতে গিয়ে এর একটা বিহিত করে আয়। আর যদি তা করতে না পারিস, তা হলে সুফিয়া ও জামাইকে সাথে করে নিয়ে আসবি।

মায়ের কথা শুনে জাকির কিছু বলতে যাচ্ছিল; খলিল তাকে দাবড়ী দিয়ে বলল, তুই চুপ কর। একটা কথা বললে মেরে হাড় গুড়ো করে ফেলব। নেসার ফকির খুব মতলববাজ লোক। তাবিজ টাবিজ করে হয়তো গোফরানকে হাত করে এই কাজ করেছে। তালই সাহেবই বা কি করে এটা মেনে নিলেন? গেলেই জানতে পারব কি করে কি হল। আজ আর যাব না। বেলা বেশি নেই, কাল যাব।

জাকির আর কোনো প্রতিবাদ করল না।

খলিল পরের দিন তাকে সঙ্গে করে সমেশপুরে সুফিয়াদের বাড়িতে এল।

সুফিয়া ও গোফরান এরকমই আশা করেছিল। তাই আগে বেড়ে কিছু জিজ্ঞেস করল না। তাদেরকে নাস্তাপানি খেতে দিল।

নাস্তা খাওয়ার পর খলিল তাদেরকে বলল, এ তোমরা কি করেছ? জাকিরের কি বিয়ের বয়স হয়েছে? আমাদেরকে না জানিয়ে বিয়ে দিলে কেন? আর যদিও বা দিলে, নেসার ফকিরের মেয়ের সঙ্গে দিলে কেন? সে যে জীন পরীদের নিয়ে থাকে, তা তোমরা আমাদের চেয়ে বেশি জান। তবু এই কাজ করতে পারলে? আম্মা জেনে তোমাদের উপর খুব রেগে আছে। আমাকে পাঠাল এর একটা বিহিত করতে।

গোফরান বলল, কি বিহিত করতে চাও বল।

খলিল বলল, বিহিত আবার কি? আমরা পরীর পেটের পরীকে ঘরে তুলবো না। নেসার ফকির পরীকে বিয়ে করে দেশ ছাড়া হয়েছে। জাকিরকে সেরকম হতে দেব না। আম্মা ছাড়কাট করাবার জন্য আমাকে পাঠিয়েছে।

গোফরান বলল, জানি তোমরা আমাদের উপর খুব রেগে আছ। তবু বলব ধৈর্য্যচুত হয়ো না। মন দিয়ে আমার কথা শোন, তোমার নেসার ফকিরের সম্বন্ধে যা কিছু শুনেছ, সে সব সত্য নয়। শোনা কথা বিশ্বাস করতে নেই। আমাদের এখানে তিনি প্রায় এক যুগের বেশি রয়েছেন। অনেকে না জেনে ওঁর সম্বন্ধে নানারকম কথা বলে বেড়ায়। আমি ওঁকে যতটা জানি আর কেউ তা জানে না। তিনি একজন কামেল ও বোজর্জ্ব লোক। সেই জন্যে তিনি স্ত্রীকে কোনো মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করতে দেন না। এমন কি ছোট বড় কোনো মেয়েকেও মুখ পর্যন্ত দেখতে দেন না। কোনো মেয়ে হয়তো হঠাৎ করে তার মুখ দেখে ফেলেছে। তার রূপ দেখে সেই মেয়ে বলে বেড়িয়েছে, নেসার ফকিরের স্ত্রী পরী। সেইজন্যে সে কাউকে মুখ দেখায় না। আর নেসার ফকিরের মতো কামেল বোজর্জ্ব লোক এই জামানায় দেখা যায় না। তবে তিনি কি করেন? কোথায় থাকেন? কেমন করে সংসার চালান? এসব গ্রামের লোক কেউ জানে না। আর কবরস্থানের পাশে থাকেন। সমাজে মিশেন না। তাই সবাই বলে থাকে, নেসার ফকির জীন পরীদের সাথে থাকেন। আমি তাদের কথা বিশ্বাস করি না। এসমস্ত গ্রামের লোকের বানানো কথা। তারপর স্ত্রীকে বলল, বৌকে এখানে নিয়ে এস।

সাদিয়া পাশের রুম থেকে ভাসুর ও দুলাভাইয়ের সব কথা শুনেছে।

সুফিয়া তার কাছে এসে বলল, তুমি নিশ্চয় সবকিছু শুনেছ; তাতে মন খারাপ করো না। এখন আমার সাথে চল, ভাসুরকে সালাম করবে।

সাদিয়া ননদের সাথে ঘোমটা দিয়ে এসে সুফিয়ার নির্দেশ মতো প্রথমে ভাসুরকে কদম বুসি করল। তারপর গোফরান, সুফিয়া ও জাকিরকে করে এক পাশে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

স্বামীর ইশারায় সুফিয়া সাদিয়ার ঘোমটা খুলে খলিলকে বলল, চেয়ে দেখ, জাকিরের বৌ কত সুন্দর হয়েছে।

খলিল সাদিয়ার মুখ দেখে চমকে উঠল। ভাবল, এও নিশ্চয় পরী। আম্মার কথাই ঠিক, পরীর পেটে পরীই হয়। এতরূপ তো মানবীর হতে পারে না। আর একবার দেখে নিয়ে গম্ভীর স্বরে বলল, ঠিক আছে, ওকে এখান থেকে নিয়ে যাও।

সুফিয়া সাদিয়াকে পাশের ঘরে রেখে ফিরে এল।

খলিল সবাইকে উদ্দেশ্য করে নিচু স্বরে বলল, আম্মার কথাই যে ঠিক, তা বৌ দেখে বুঝতে পারলাম।

সুফিয়া বলল, আম্মা কি বলেছে?

খলিল আম্মার কথা বলে বলল, তোমরাই বল, কোনো মানবী কি এত সুন্দরী হয়?

গোফরান বলল, কে বলেছে হয় না? নিশ্চয় হয়। দুনিয়াতে এমন অনেক দেশ আছে, যেখানকার মেয়েরা এই বৌয়ের থেকে সুন্দরী।

খলিল বলল, আমি বিশ্বাস করি না।

গোফরান বলল, বিশ্বাস হবে কি করে? দেশ ভ্রমন তো করনি। করলে বিশ্বাস হত। ওসব কথা বাদ দিয়ে যা বলছি শোন, আম্মা যা বলেছেন তা ঠিক নয়। তিনি

শোনা কথা বলেছেন। এই মেয়ে ছোটবেলায় মক্তবে ও স্কুলে পড়েছে। সেয়ানা হয়ে যেতে নেসার ফকির আর স্কুলে পাঠান নি। কিন্তু ঘরে নিজে অনেক পড়িয়েছেন। একে অনেকবার আমরা দেখেছি। খলিল ভাই, একটা কথা আমাদের মনে রাখা উচিত, আল্লাহ পাকের দুনিয়ায় কত আশ্চার্য্য জিনিস আছে, আর কত আশ্চার্য্য ঘটনা ঘটছে, তার কয়টার খবর আমরা রাখি।

খলিল বলল, তোমার কথা ঠিক; কিন্তু আম্মা যেজন্যে আমাকে পাঠিয়েছে, তার কি হবে?

গোফরান বলল, তুমি তো হঠাতে এদিকে পা বাড়াও না। এসেই যখন পড়েছ তখন দু'চার দিন বেড়িয়ে যাও। তারপর গিয়ে আম্মাকে বলো, আমি ও তোমার বোন কয়েক দিনের মধ্যে আসছি। আর ছাড়কাটের কথা যে বললে, তা একেবারে অসম্ভব। এটা অবাস্তব কথা।

খলিল একটু রেগে গিয়ে বলল, কেন?

গোফরান বলল, কেনর উত্তর দিতে গেলে অনেক কথা বলতে হবে। তার মধ্যে প্রধান কয়েকটা বলছি–

১. স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে কেউ কোনো প্রকার বড় অন্যায় না দেখলে তালাক দেয়া বা তালাকের ব্যবস্থা করা শরীয়তে নিষেধ। সে রকম এরা কেউ করেনি।

২. শরীয়তের বিধান মতে বালেগ ছেলে মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে যেমন স্বাধীনতা আছে, তেমনি অনিবার্য্য কারণে তালাক দেয়ারও স্বাধীনতা আছে। শরীয়তের আইন অনুযায়ী ওরা দু'জনেই বালেগ। ওদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অন্যেরা জোর করে তালাক দেয়ালে কঠিন গোনাহ হবে।

৩. ওরা ছেলেবেলা থেকে দু'জন দু'জনকে ভীষণ ভালবাসে। আমার মনে হয় জোর করে ছাড়কাট করালে দু'জনেরই জীবন নষ্ট হবে।

৪. তালাকের ব্যাপারটা স্বামী স্ত্রীর নিজস্ব ব্যাপার। সে ব্যাপারে অন্য কারো মাথা গলান শক্ত গোনাহ।

এই পর্যন্ত বলে গোফরান কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে আবার বলল, খলিল ভাই, মনে কিছু করো না। আমি তোমার ও আম্মার কথা রাখতে পারলাম না বলে দুঃখিত। তবে হ্যাঁ, তোমাদের না জানিয়ে এই কাজ করাটা আমার ও সুফিয়ার খুব অন্যায় হয়েছে। সেজন্যে আমরা অপরাধ স্বীকার করছি। নেসার ফকির খুব তড়িঘড়ি করলেন, তাই তোমাদেরকে জানাবার ফুরসত পেলাম না। দু'চার দিনের মধ্যে আমরা গিয়ে আম্মার কাছে মাফ চাইব।

খলিল বলল, তোমরা যাই বল না কেন, সে যে একজন মতলববাজ, তা তোমরা বুঝতে না পারলেও আমরা পেরেছি। যদি ভালো লোক হত, তা হলে আমাদেরকে না জানিয়ে তোমাকে হাত করে তড়িঘড়ি কাজটা সমাধা করত না। আমি আর একদণ্ড এখানে থাকব না। জাকিরকে নিয়ে এক্ষুনি চলে যাব। কোনো দিন এই বৌকে ঘরে তুলব না। আর জাকিরকেও এদিকে আসতে দেব না। এই কথা বলে সে চলে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াল।

সুফিয়া এতক্ষণ কোনো কথা বলেনি। খলিলকে উঠে দাঁড়াতে দেখে বলল, খলিল, তুই আমাদেরকে ভুল বুঝতেছিস। যাই হোক, চলেই যখন যাবি তখন এবেলা থেকে যা, বিকেলে যাবি। তা না হলে আমরা মনে খুব কষ্ট পাব।

অগত্যা খলিল সেবেলা থেকে গেল। বিকেলে যাওয়ার সময় জাকিরকে বলল, তুইও আমার সঙ্গে চল।

জাকির বলল, তুমি যাও, আমি পরে যাব।

খলিল রেগে গিয়ে বলল, না এক্ষুনি আমার সঙ্গে যাবি।

জাকির নির্ভীক কণ্ঠে বলল, বললাম তো পরে যাব।

খলিল রাগ সামলাতে পারল না। গর্জে উঠে বলল, কি তোর এত বড় সাহস? বিয়ে করতে না করতেই এখনি আমার মুখের উপর কথা বলছিস? দেখাচ্ছি মজা বলে মারার জন্য হাত তুলে এগিয়ে এল।

গোফরান খলিলকে ধরে ফেলল, আর সুফিয়া জাকিরকে আগলে রেখে খলিলকে উদ্দেশ্য করে বলল, আমাদের সামনে জাকিরকে মারতে চাস, এটা কি তোর উচিত? ও এমন কিছু অন্যায় করেনি যে জন্যে তুই ওকে মারবি। তোর মনে রাখা উচিত, জাকির এখন বড় হয়েছে, বিয়ে করেছে। ওর স্বাধীন মত প্রকাশ করার মতো জ্ঞানও হয়েছে।

খলিল আর কিছু না বলে দ্রুত সেখান থেকে বেরিয়ে বাড়ির পথ ধরল।

খলিল চলে যাওয়ার পর সুফিয়া জাকিরকে বলল, তুই ওঘরে যা।

জাকির এসে দেখল, সাদিয়ার চোখ থেকে টপটপ করে পানি পড়ছে। বলল, এত সামান্য ব্যাপারে তুমি কাঁদছ কেন?

সাদিয়া তার পায়ের কাছে বসে দু'পা জড়িয়ে ধরে ভিজে গলায় বলল, আমার জন্য আপনাকে অপমান হতে হল।

জাকির তাকে তুলে আলিঙ্গনবদ্ধ করে বলল, পাগলী, এতে অপমান হলাম কোথায়? বড়ভাই রাগারাগী করলে বা মারধর করলে অপমান হয় না। বড়ভাই বাপের মতো। প্রয়োজন হলে শাসন করবে। ওসব নিয়ে আমি চিন্তা করি না। তারপর আলিঙ্গন মুক্ত করে তার চোখের পানি মুছে দেয়ার সময় বলল, তুমি ঐদিন বললে না, আব্বা আমাদেরকে ধৈর্য্য ধরতে বলেছেন?

সাদিয়া বলল, বড় ভাইয়া আপনাকে রাগারাগী করতে শুনে সে কথা ভুলে গিয়েছিলাম।

এদিকে বাড়িতে এসে খলিল আম্মাকে সবকথা জানিয়ে বলল, বুবু আমাকে ছোট বৌকে দেখিয়েছে। এত রূপ কোনো মেয়ের থাকতে পারে না। আমার ধারণা, ছোট বৌ পরী।

দিলারা খানম শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, ঠিক আছে, সুফিয়া ও জামাই আসুক তারপর যা করার করা যাবে।

এই ঘটনার কয়েকদিন পর নেসার ফকির এনায়েতপুরে জাকিরদের বাড়িতে এলেন।

খলিল তার পরিচয় পেয়ে এবং তার বেশভুষা দেখে খুব রেগে গিয়ে বলল, আমার ভাইকে ছেলে মানুষ পেয়ে খুব চালাকির সাথে তাকে জামাই করেছেন। এখানে আবার এসেছেন কেন?

নেসার ফকির তার রাগকে গ্রাহ্য না করে খুব নরম সুরে বললেন, আমি আপনার আম্মার সঙ্গে কথা বলতে এসেছি। আপনি রাগ করছেন কেন? আল্লাহ পাকের ইশারা ছাড়া বিশ্ব জগতে কিছুই ঘটে না।

খলিল রাগের সাথেই বলল, কিন্তু মানুষকে আল্লাহ বিবেক দিয়ে যা ইচ্ছা তা করার ক্ষমতা দিয়েছেন। তাই মানুষ ছলে বলে কৌশলে নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য যা ইচ্ছা তাই করছে। আপনিও সেই সুযোগের সদব্যবহার করেছেন।

নেসার ফকির বললেন, আপনার কথা অবশ্য ঠিক। তবে আমি কি জন্যে করেছি, তা আপনাকে বলব না, আপনার আম্মাকে বলব। পর্দার আড়াল থেকে ওঁর সঙ্গে কয়েকটা কথা বলে আমি চলে যাব।

খলিল চিন্তা করল, আমি যা বলার বলেছি, এবার আম্মা বলবে। বলল, ঠিক আছে, আপনি অপেক্ষা করুণ, আমি আম্মাকে খবর দিচ্ছি। তারপর বাড়ির ভিতরে গিয়ে আম্মাকে বলল, জাকিরের শ্বশুর সেই নেসার ফকির এসেছে। সে তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। তাকে আমি যাতা করে অনেক কিছু বলে তাড়িয়ে দিতে চেয়েছি; কিন্তু সে নাছোড়বান্দা। তোমার সঙ্গে কথা না বলে যাবে না।

দিলারা খানমও নেসার ফকিরের কথা শুনে রেগে গেলেন। কিন্তু সংযতস্বরে বললেন, তুই যা কিছু বলেছিস ভালই করেছিস। তবে প্রথমেই তাকে কিছু বলা তোর উচিত হয়নি। হাজার হোক সে মেহমান। প্রথমে তার মেহমানি করান উচিত ছিল। তারপর যা বলার বলতিস। যাকগে, যা হওয়ার হয়েছে। এখন ওঁর মেহমানির ব্যবস্থা কর। তারপর উনি কি বলেন শোনা যাবে।

খলিল মায়ের কথায় খুশি হতে পারল না। তবু তার কথামতো সবকিছু ব্যবস্থা করল।

খাওয়া দাওয়ার পর খলিল নেসার ফকিরকে বলল, আম্মা দরজার বাইরে এসেছে, আপনি কি বলবেন বলুন।

নেসার ফকির তাকে বললেন, আপনি কিছু মনে করবেন না, আমি একাকি ওঁর সঙ্গে কথা বলতে চাই।

খলিল রেগে উঠল। কিন্তু তা প্রকাশ না করে বাইরে চলে গেল।

খলিল চলে যাওয়ার পর নেসার ফকির দিলারা খানমকে সালাম দিয়ে নিচুস্বরে এমন কিছু কথা বললেন, যা শুনে দিলারা খানমের রাগ পানি হয়ে গেল এবং নিজেকে অপরাধী মনে করলেন। অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, আমরা আপনার সম্বন্ধে নানারকম আজেবাজে কথা শুনেছিলাম। তাই আমাদেরকে না জানিয়ে জাকিরকে জামাই করেছেন শুনে আপনার প্রতি খুব অসন্তুষ্ট হয়ে যাতা করে বলেছি। আমার বড় ছেলেও আপনাকে অনেক কিছু বলে অপমান করেছে। আপনি আল্লাহওয়ালা লোক, আমাদেরকে মাফ করে দিন।

নেসার ফকির বললেন, আমাকে অত বড় করে বলবেন না। যা বললেন, তা যদি আমি না হই; তা হলে আপনি গোনাহগার হবেন। আল্লাহওয়ালা হওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, আল্লাহপাক আমাদের সবাইকে মাফ করুন। আমি কোনো দিন কারো কথায় মনে কিছু করি না। এবার দু'একটা অনুরোধ করছি, আপনি আমার মেয়েকে নিজের মেয়ের মতো দেখবেন। দোষ ত্রুটি করলে মাফ করে শুধরে দেবেন। বিয়ের ব্যাপারে আপনার মেয়ে জামাইয়ের কোনো দোষ নেই। আমি নিজে এই কাজ করিয়েছি। তাদের উপর মনে কষ্ট রাখবেন না। ছেলে বৌকে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করবেন। আমার আর কিছু বলার নেই। এখন আমাকে যাওয়ার এজাজত দিন বিয়ান সাহেবা।

দিলারা খানম বললেন, আজ থেকে যান, কাল না হয় যাবেন।

নেসার ফকির বললেন, না বিয়ান সাহেবা, আমি থাকতে পারব না। আপনার বিয়ান ঘরে একা আছে।

দিলারা খানম বললেন, তা হলে তো আপনাকে আটকাতে পারব না। আবার আসবেন। ইনশাআল্লাহ আমি আপনার কথামতো সবকিছু করব।

নেসার ফকির আলহামদুল্লিাহ বলে সালাম বিনিময় করে বিদায় নিয়ে ফিরে চললেন।

ফেরার পথে প্রথমে গোফরানদের বাড়িতে গিয়ে তাকে বললেন, আমি আপনার শাশুড়ীর সঙ্গে দেখা করে যা বলার বুঝিয়ে বলে এসেছি। আপনি আপনার স্ত্রী, জাকির ও সাদিয়াকে নিয়ে দু'চার দিনের মধ্যে সেখানে যাবেন। তারপর সাদিয়ার সঙ্গে দেখা করে অনেক কথা বুঝিয়ে বলে বাড়ি চলে গেলেন।

নেসার ফকির চলে যাওয়ার পর খলিল ঘরে এসে মাকে জিজ্ঞেস করল, ফকির বেটা কি বলে গেল?

দিলারা খানম রেগে গিয়ে বললেন, মুরুব্বি লোকের সম্বন্ধে এরকম বেয়াদবের মতো কথা বলছিস কেন? তোর তালই সাহেব হন না? তা ছাড়া উনি খুব কামেল লোক।

খলিল বুঝতে পারল, ফকির বেটা নিশ্চয় মাকে বশ করে তার মন ঘুরিয়ে ফেলেছে। বলল, মুরুব্বিলোক অন্যায় করলে বলব না কেন? একশবার বলব।

দিলারা খানম আরও রেগে গিয়ে বললেন, না, বলবি না। আমি ওঁর সঙ্গে দু'চারটে কথা বলে এবং ওঁর কথা শুনে বুঝেছি উনি খুব বোজর্গ্ত লোক। ওঁর মেয়েকে যে আমাদের বাড়িতে বিয়ে দিয়েছেন, সেটা আমাদের সৌভাগ্য। তুই ওঁর সম্বন্ধে আজেবাজে কথা বলবি না। যা বলছি শোন, যত তাড়াতাড়ি পারিস সমেশপুরে গিয়ে জাকিরকে ও বৌকে নিয়ে আয়।

খলিলও রেগে গিয়ে বলল, ফকির বেটা নিশ্চয় কিছু করে তোমাকে বশ করেছে। তাই তুমি ঘুরে গেছ। আমি ঐ মতলববাজের মেয়েকে ঘরে আনতে পারব না।

দিলারা খানম গর্জে উঠে বললেন, তুই ছেলেমেয়ের বাপ হয়েও আমার সঙ্গে তর্ক করেছিস। তোর আব্বা বেঁচে থাকলে মুখের উপর কথা বলতে পারতিস? তুই আমার কথার অবাধ্য হবি, একথা ভাবতেই পারছি না। ঠিক আছে, আমি অন্য কাউকে দিয়ে জাকিরকে খবর পাঠাব, সে যেন বৌকে নিয়ে ঘরে আসে। কথা বলতে বলতে ওঁর চোখে পানি এসে গেল। কথা শেষ করে আঁচলে চোখ মুছতে লাগলেন।

মায়ের কথা শুনে ও চোখে পানি দেখে খলিলের রাগ পড়ার সাথে সাথে নিজের ভুল বুঝতে পারল। বলল, রাগের বশে আমি অন্যায় করে ফেলেছি আম্মা। তুমি আমাকে মাফ করে দাও। আমি দু'তিন দিনের মধ্যে ওদেরকে আনতে সমেশপুর যাব।

খলিলের স্ত্রী নিহারবানু স্বামীর ও শাশুড়ীর কথা শুনেছে। তখন কিছু না বললেও পরে স্বামীকে বলল, তুমি যে ছোট বৌকে আনতে যাবে, সে যদি পরী হয়, তা হলে কি হবে? শুনেছি পরীরা মানুষের বাচ্চাদের সহ্য করতে পারে না। আমার ছেলেমেয়েদের অনেক কষ্ট দেবে।

খলিল বলল, আমিও ঐরকম শুনেছি। কিন্তু ফকির বেটা আম্মাকে বশ করে ফেলেছে। ভেবে দেখলাম, ছোট বৌকে না আনলে আম্মা ভীষণ মনে কষ্ট পাবে। নিয়ে এসে দেখি না, সে সত্যি পরী কিনা। যদি তাই হয়, তা হলে সংসার আলাদা করে নেব।

নিহারবানু বলল, তোমার বুদ্ধি বলতে কিছু নেই। সংসার আলাদা হয়ে গেলে ছোটবৌ হিংসা করে আরও বেশি আমাদের ক্ষতি করবে।

জাকির পরীকে বিয়ে করেছে বলে যে শুধু তার রাগ তা নয়। নিহারবানুর খুব ইচ্ছা ছিল, ছোট বোন জয়নাবকে জা করার। তা হল না, দেখে সাদিয়ার উপর তার খুব হিংসা। তাই স্বামীকে চুপ করে থাকতে দেখে বলল, আহা রে কত আশা ছিল, জয়নাবকে জা করে ঘরে আনব।

খলিল স্ত্রীর কথায় রেগে গিয়ে বলল, রাখ তোমার প্যাচাল। ছোটবৌ কি আর সত্যি সত্যি পরী নাকি? তারপর সে বাইরে চলে গেল।

খলিল রাগের মাথায় স্ত্রীর কাছে ঐ কথা বললেও বাইরে এসে চিন্তা করল, সেদিন ছোট বৌকে দেখে কিন্তু পরীর মতো মনে হয়েছিল। সত্যি কি মানুষের সাথে পরীর বিয়ে হয়? মসজিদের ইমাম সাহেব আলেম লোক। ওঁকে জিজ্ঞেস করে দেখা যাক। এইভেবে ইমাম সাহেবের কাছে গিয়ে সালাম বিনিময় করে বলল, আচ্ছা হুঁজুর, মানুষের সঙ্গে কি পরীর বিয়ে হয়?

একান সেকান করে জাকিরের বিয়ের কথা এবং নেসার ফকিরের কথা ওঁর কানেও পড়েছে। খলিলের কথা শুনে ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন। তবু না বুঝার ভান করে বললেন, কি ব্যাপার,, হঠাৎ একথা জিজ্ঞেস করছেন কেন?

খলিল বলল, সে কথা পরে বলব। আগে আমার কথার উত্তর দিন।

ইমাম সাহেব বললেন, আপনার প্রশ্নের উত্তর, আমার প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে আছে। তাই আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

খলিল একটু বোকা ধরণের। ইমাম সাহেবের চালাকি ধরতে পারল না। বলল, নেসার ফকিরের কথা বোধ হয় আপনি শুনেছেন, তাই না?

ইমাম সাহেব বললেন, হ্যাঁ শুনেছি।

খলিল বলল, সেই নেসার ফকির আমার বোন ও বোনাইকে হাত করে তার মেয়ের সঙ্গে জাকিরের বিয়ে দিয়েছে। আমরা শুনেছি, নেসার ফকিরের স্ত্রী পরী। সেই পরীর পেটের মেয়েও নিশ্চয় পরী? সেই মেয়েকে আমরা ঘরে তুলি কি করে বলুন তো হুঁজুর?

ইমাম সাহেব বললেন, পরীর চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলুন। যেদিন নেসার ফকির আপনাদের বাড়িতে এসেছিলেন, সেদিন আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। পরিচয় হওয়ার পর কিছুক্ষণ কথা বলে বুঝতে পারলাম, ওঁর সম্বন্ধে যা কিছু শুনেছি তা ভুল। উনি খুব কামেল ও আল্লাহওয়ালা লোক। জাকিরের ও আপনাদের খুব সৌভাগ্য, ওঁর মেয়ে আপনাদের বাড়ির বৌ হয়েছে। শুনলাম, আপনারা সেই মেয়েকে ঘরে তুলেন নি, আপনার বোনের বাড়িতে রয়েছে। আমার কথা শুনুন, ঐসব বাজে চিন্তা না করে জাকির ও তার বৌকে ঘরে নিয়ে আসুন।

খলিল আর কিছু বলতে না পেরে সালাম বিনিময় করে ফিরে আসার সময় ভাবল, ফকির বেটা নিশ্চয় যাদু জানে। তা না হলে যার সঙ্গে কথা বলে সেই তার বশ হয়ে যায়। কি আর করা, বৌকে এনেই দেখা যাক।

তখন চাষের মৌসুম। যাই যাই করেও কাজের চাপে খলিল সমেশপুর যেতে পারছে না। কাজের চাপ কমার পর যেদিন যাবে বলে ভাবল, সেদিন বেরোবার আগে গোফরান সবাইকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি এসে পৌঁছাল।

সুফিয়া মাকে সালাম করে সাদিয়াকে বলল, সালাম কর, উনি আম্মা।

সাদিয়া সালাম করতে দিলারা খানম বৌয়ের মাথায় চুমো খেয়ে বুকে জড়িয়ে দো'য়া করলেন, "আল্লাহ তোমাদের দু'জনের হায়াতে তৈয়েবা দিক, তোমাদেরকে সুখী করুক। তারপর বৌয়ের মুখে চাদর জড়ান দেখে তা সরিয়ে দিয়ে খুব অবাক হলেন। ভাবলেন, খলিলের আর দোষ দেব কি, যে কেউ বৌকে দেখবে, সেই পরী মনে করবে। তাড়াতাড়ি চাদরটা আগের মতো ঢেকে দিলেন। তারপর নিহারবানুকে দেখিয়ে বললেন, তোমার বড় জা, সালাম কর।

দিলারা খানম যখন সাদিয়ার মুখের চাদর সরিয়ে মুখ দেখেন তখন নিহারবানু ও দেখেছে। দেখে তার ভিমরী খাবার মতো উপক্রম হয়েছিল এখন সালাম করতে এলে কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে বলল, আমাকে সালাম করতে হবে না।

পাড়ার মেয়েরা জানতে পেরে বৌ দেখার জন্য ভীড় করতে লাগল। সুফিয়া তাদেরকে পরে আসার কথা বলে বিদায় করে দিল। তারপর জাকিরকে বলল, তুই ছোটবৌকে নিয়ে তোর ঘরে যা।

জাকির সাদিয়াকে নিয়ে ঘরে চলে যাওয়ার পর সুফিয়া মাকে তার ঘরে নিয়ে গিয়ে বলল, আম্মা, তুমি ছোট ভাবিকে খুব সাবধানে রাখবে। ও খুব সুখী মেয়ে। আর পাড়ার কোনো মেয়েকেই ওর মুখের কাপড় সরিয়ে দেখাবে না।

দিলারা খানম বললেন, তুই ঠিক কথা বলেছিস। ছোট বৌকে যে দেখবে, সেই পরী মনে করবে।

পরে যখন মেয়েরা বৌ দেখতে এল তখন সুফিয়া সাদিয়াকে মুখ ঢাকা অবস্থায় দেখাল। মেয়েরা মুখের কাপড় সরাতে বললে বলল, মুখের কাপড় সরান যাবে না।

মেয়েদের মধ্যে অনেকে বলে উঠল, এ কেমন কথা? বৌয়ের মুখ না দেখলে বৌ দেখা হয় নাকি? তারপর তারা ভালোমন্দ নানারকম মন্তব্য করতে করতে ফিরে গেল। যেতে যেতে বলাবলি করতে লাগল, জাকিরের বৌয়ের হাত পায়ের আঙ্গুল ও চোখ দেখে বোঝা গেল, বৌ খুব সুন্দরী। কিন্তু সুন্দরী বৌ বলে কাউকে মুখ দেখাবে না, একথা বাপের বয়সে শুনিনি। দেখব কতদিন মুখ না দেখিয়ে থাকতে পারে। মানুষ কথাই বলে, "প্রথম দিকে নতুন বৌয়ের মুখ দেখা না গেলেও কিছুদিন পর তার পঁদও দেখা যায়।" এই কথায় সবাই হেসে উঠল।

একজন বয়স্কা মেয়ে বলল, তোদের কথা অবশ্য ঠিক; তবে আমার কিন্তু অন্য কথা মনে হচ্ছে।

নাতবৌ সম্পর্কের মেয়েরা বলে উঠল, কি কথা মনে হচ্ছে, বল না দাদি।

বয়স্ক মেয়েটি বলল, কেন, তোরা কি নেসার ফকিরের কথা শুনিসনি? সে পরীকে বিয়ে করেছে। আর জাকির সেই পরীর পেটের মেয়েকে বিয়ে করেছে। পরীর পেটের মেয়ে পরীই হয়। আমরা জেনে যাব বলে কাউকে মুখ দেখাল না।

অন্য মেয়েরা বলল, হ্যাঁ দাদি আপনার কথাই ঠিক।

বয়স্কা মেয়েটি আবার বলল, আমার কথা ঠিক কিনা এখন বলতে পারছি না, তবে কিছুদিন পর সত্য মিথ্যা জানা যাবে।

সুফিয়া তিন চারদিন থেকে স্বামীর সঙ্গে সমেশপুর ফিরে এল।

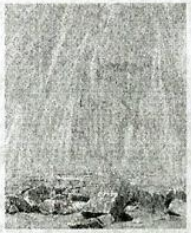

সাদিয়া শ্বশুর বাড়িতে এসে শাশুড়ীর সহযোগিতায় কিছু দিনের মধ্যে সংসারের কাজে পারদর্শী হয়ে উঠল। বেশীরভাগ কাজ সেই করে। বড় জা তার উপর অসন্তুষ্ট তা বুঝতে পেরে তাকে খুশি রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু নিহারবানু খুশি হতে পারে না। তার মনে শান্তি নেই। কারণ ছোট জায়ের সবকিছু ভালো হলে কি হবে ঐ যে কথায় আছে না, "যাকে দেখতে না পারি, তার চলন বাঁকা।" এক ঘরে কতক্ষণ আর সাদিয়া নিজেকে ঢেকে রাখবে? নিহারবানু যত তাকে দেখছে, তত তার রূপ ও কাজকাম দেখে দৃঢ় ধারণা হচ্ছে, সে পরী। তাই আতঙ্কিত হয়ে সংসার আলাদা করে নেয়ার জন্য স্বামীর কান ভারী করতে লাগল।

একদিন নিহারবানুর কোলের বাচ্চা মেয়েটা ঘুম থেকে উঠে খুব চেচাঁচ্ছিল। নিহারবানু তখন পুকুরঘাটে গোসল করতে গেছে।

সাদিয়া গোসল অথবা পেশাব পায়খানার জন্য কোনোদিন পুকুরঘাটে যায় না। এমন কি কোনো কারণেই সে ঘরের বাইরে পা রাখেনি। ঐ সবের জন্য জাকির উঠোনের একদিকে বেড়া দিয়ে ঘিরে ব্যবস্থা করে দিয়েছে। প্রতিদিন রাতে জাকির সেখানে পুকুর থেকে পানি এনে মটকা ভরে রাখে। সাদিয়া ফজরের নামাযের আগে সেই পানিতে যা কিছু করার করে নেয়। এখন সে জোহরের নামায পড়ে কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করছিল। বাচ্চার কান্না শুনে কুরআন শরীফ পড়া বন্ধ রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে বাচ্চাকে কোলে নিল। তারপর চুমো খেতে খেতে আদর করে কান্না থামাতে চেষ্টা করল। দিলারা খানম তখনও নামায পড়ছিলেন।

এমন সময় নিহারবানু ঘাট থেকে ফিরে দৃশ্যটা দেখে ভাবল, সাদিয়া বাচ্চার গালে কামড়াচ্ছে, তাই সে চিৎকার করে কাঁদছে। ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি এসে সাদিয়ার কাছ থেকে ছোঁমেরে কেড়ে নিয়ে বলল, তুমি মানুষ না অন্য কিছু? তা না হলে দুধের বাচ্চাকে কামড়ে মেরে ফেলতে চাচ্ছ?

বড় জায়ের কথা শুনে সাদিয়া যেমন খুব অবাক হল তেমনি মনে ব্যথাও পেল। ছলছল চোখে বলল, বুবু, আপনি এমন কথা বলতে পারলেন?

নিহারবানু বলল, পারব না কেন? নিজের চোখেই তো দেখলাম।

সাদিয়া আর কোনো কথা না বলে চোখ মুছতে মুছতে নিজের রুমে চলে গেল।

নিহারবানু শাশুড়ীকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে লাগল, জাকির ভাই পরীকে বিয়ে করে এনেছে। পরীরা মানুষের ক্ষতি করে শুনেছি; কিন্তু এই পরীতো আমার দুধের বাচ্চাবে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। ঘাট থেকে ফিরতে আর একটু দেরি হলে মেরেই ফেলত।

দিলারা খানম নামায শেষ করে তার কাছে এসে বললেন, বড় বৌ, এ তুমি বি কথা বলছ? এরকম কথা আর বলবে না।

সাদিয়া আসার পর থেকে নিহার বানু লক্ষ্য করেছে, শাশুড়ী তাকেই বেশি ভালবাসেন। সংসারের কাজ বেশি করতে নিষেধ করেন। সব সময় তাকে যেন আগলে রাখেন। আগে অসুখ বিসুখ হলে খোঁজ খবর নিতেন। সাদিয়া আসার পর থেকে তেমন আর ভালো খোঁজ খবর রাখেন নি। এইসব দেখে শুনে নিহারবানু শাশুড়ীর প্রতি বেশ রাগ ও অভিমান ছিল। এখন ওঁর কথা শুনে বলল, কেন বলব না? তারপর মেয়ের একদিকের গাল দেখিয়ে বলল, দেখুন না, ঐ পরীটা কামড়ে লাল করে দিয়েছে।

দিলারা খানম দেখে বললে, এটা তো মাথার শক্ত বালিশের দাগ। কামড়ালে তো দাঁতের দাগ থাকত? তাপরপর সাদিয়ার কাছে গিয়ে বললেন, ছোট বৌ, কি হয়েছে বলতো?

সাদিয়ার চোখ থেকে তখনও পানি পড়ছিল। সেই অবস্থাতেই যা হয়েছিল তা বলে বলল, সত্যি বলছি আম্মা, আমি ফেরেস্তার মতো নিষ্পাপ বাচ্চাকে কামড়ায়নি। কোনো মেয়ে কি তা পারে?

দিলারা খানম তার চোখের পানি মুছে দিয়ে বললেন, আমি বড় বৌয়ের কথা বিশ্বাস করিনি। তুমি কেঁদ না মা। তারপর বড় বৌয়ের কাছে এসে বললেন, ছোট বৌ তোমাদের ছেলেমেয়েদের কত ভালবাসে, আদর যত্ন করে, আর তুমি কি না তাকে এরকম করে তার বদনাম করছ? আসলে ছোট বৌকে তুমি দেখতে পার না। আর কখনও ঐ রকম কথা বলবে না। এতদিন হল তোমার সঙ্গে রয়েছে, সে পরী না সত্যিকার মেয়ে মানুষ তা বুঝতে পারলে না?

নিহারবানু মুখ গোমরা করে নিজের রুমে চলে গেল।

ঐদিন রাতে নিহারবানু স্বামীকে দুপুরের ঘটনাটা সত্য মিথ্যা করে বাড়িয়ে বলে বলল, তোমাকে কতদিন থেকে বলছি সংসার আলাদা করে নাও; আমার কথা যদি কানে তোলো। যেদিন ঐ পরীটা আমাদের বাচ্চাকে শেষ করে দিবে, সেদিন টের পাবে।

খলিল প্রথম থেকে জাকিরের বিয়ে মেনে নিতে পারেনি। এত অভাবের মধ্যে অনেক কষ্ট করে তাকে লেখাপড়া করিয়েছে। তার মনে কত আশা ছিল, জাকিরকে এম.এ. পর্যন্ত পড়াবে। বড় চাকরি করে অনেক টাকা পয়সা এনে তার হাতে দেবে। সেই টাকা দিয়ে বাড়ি-ঘর করবে, জমি জায়গা কিনবে। তারপর বড় ঘরে বিয়ে দিয়ে সুন্দরী বৌ ঘরে তুলবে। আর সে কিনা গোপনে এরই মধ্যে বিয়ে করে ফেলল? তাও একটা পরীর মেয়েকে? শুয়ে শুয়ে খলিল এইসব চিন্তা করছিল। স্ত্রীর কথা শুনেও কিছু বলল না।

স্বামীকে চুপ করে থাকতে দেখে। নিহারবানু বলল, তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ না?

খলিল বলল, পাচ্ছি।

তা হলে কিছু বলছ না কেন?

চিন্তা করছি।

কি চিন্তা করছ?

চিন্তা করছি, তোমার কথাই ঠিক; কিন্তু আম্মাকে সংসার আলাদা করার কথা বলব কি করে? বললে আম্মা মনে খুব কষ্ট পাবে।

সংসার তো চিরকাল একসাথে থাকবে না। দু'বছর আগে হোক পরে হোক আলাদা হবেই। এটাই দুনিয়ার নিয়ম।

তা অবশ্য ঠিক। তবে কি জান এখন হলে লোকও দুনার্ম করবে। বলবে রহিম উদ্দিন বেঁচে থাকলে খলিল ছোট ভাই বিয়ে করার পরেই আলাদা করে দিতে পারত না। তা ছাড়া আম্মা রাজি হবে কিনা ভাববার কথা।

তুমি আম্মার কথা চিন্তা করো না। তিনি যে ছেলের কাছে থাকতে চাইবেন তার কাছেই থাকবেন। আর অন্যে কে কি বলবে না বলবে ভেবে নিজের ছেলেমেয়ের ভালোমন্দ চিন্তা করবে না? ঐ পরীকে দেখলেই আমার ছেলেমেয়েরা ভয়ে এতটুকু হয়ে যায়। তাহমীনার জন্য খুব চিন্তা হয়। সে ওর কাছে পড়াশোনা করে। কবে কি করে ফেলে তার কোনো ঠিক নেই।

খলিল একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, ভেবে দেখি কি করা যায়? এখন শুয়ে পড় রাত হয়েছে।

খলিল কয়েকদিন ভেবেও কিছুই ঠিক করতে পারল না, কিভাবে মাকে সংসার আলাদা করার কথা বলবে।

নিহারবানু স্বামীর মনোভাব বুঝতে পেরে নিজেই সিদ্ধান্ত নিল....যেভাবেই হোক সংসার আলাদা করে নিতে হবে। তাই একদিন সাদিয়াকে সংসারের কোনো কাজ করতে দিল না।

সাদিয়া জোর করে করতে এলে নিহারবানু মেজাজ দেখিয়ে বলল, কাজ করলে তোমার সোনার অঙ্গ নষ্ট হয়ে যাবে, রুপ মলিন হয়ে যাবে। যাও, ঘরে গিয়ে রূপচর্চা কর। আমার কোনো ছেলেমেয়েকে আদর-যত্নও করতে হবে না।

সাদিয়া এ বাড়িতে পা দিয়ে বুঝতে পেরেছিল, বড় জা তাকে পছন্দ করে না। তাই সে তার মন যুগিয়ে চলার চেষ্টা করে। তবু মাঝে মাঝে তার ব্যবহারে মনে খুব ব্যাথা পেলেও সহ্য করে নেয়। কোনো প্রতিবাদ করেনি। আজ তার কথা শুনে বলল, কেন আপনি এই কথা বললেন? আমার কোনো দোষ থাকলে বলুন, শুধরে নেব।

নিহারবানু বলল, কারো দোষ ধরে আমি দোষী হতে পারব না। যা বললাম তাই করগে যাও।

সাদিয়া আর কিছু না বলে রুমে এসে চোখের পানি ফেলতে লাগল।

জাকির এসব জানতে পারল না। পরীক্ষার ফল বেরোবার পর কি করবে সেই চিন্তা মাথায় নিয়ে বড় ভাইয়ের সাথে মাঠে চাষ বাসের কাজ করছে।

কয়েকদিন পর একরাতে সাদিয়াকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে দেখে জাকির তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, এই, তুমি কাঁদছ কেন? শরীর খারাপ লাগছে?

সাদিয়া কিছু না বলে ফোঁপাতেই থাকল।

জাকির তাকে আদর করতে করতে বলল, তুমি তো জান সাদিয়া, তোমার জন্য আমি আমার প্রাণও বাজী রাখতে পারি। বল কি হয়েছে?

কথাটা বলা ঠিক হবে কিনা বুঝতে না পেরে সাদিয়া স্বামীকে জড়িয়ে ধরে তার বুকে মুখ ঘসতে লাগল।

জাকির বলল, আম্মার জন্য মন ছটফট করলে বল, কয়েকদিনের জন্য না হয় তোমাকে তার কাছে রেখে আসি।

এবার সাদিয়া কান্না থামিয়ে বলল, আম্মার জন্য মন ছটফট তো করবেই। তবে সে জন্যে কাঁদছি না। আর আপনাকে ছেড়ে আম্মার কাছে থাকতেও পারব না।

জাকির বলল, তা হলে কি হয়েছে বলবে তো?

সাদিয়া বড় জায়ের কথা বলল।

আম্মা জানে?

না।

তাকে জানাওনি কেন? জানান উচিত ছিল।

জানলে সংসারে অশান্তি হবে ভেবে জানাইনি।

ঠিক আছে, আমি বলব।

বললে যদি অশান্তি হয়।

হয় হবে। তাই বলে এর একটা বিহিত করতে হবে না? তা না হলে এভাবে তুমি কতদিন কাটাবে?

আমার কিন্তু বেশ ভয় করছে।

জাকির স্ত্রীকে আদর করতে করতে বলল, ভয় কিসের, আমি তোমার পাশে রয়েছি না? আর আল্লাহপাক ন্যায় বিচারক ও অসীম দয়ালু। আমরা ন্যায়ের পথে থাকলে তিনি আমাদের সাহায্য করবেন। তারপর তার চোখ মুখ মুছে দিয়ে কয়েকটা চুমো-খেয়ে বলল, ওসব কথা আপাতত থাক; যা বলছি শোন, খুব সম্ভব কাল আমার পরীক্ষার ফল বেরোবে। আজ তাহাজ্জুদের নামায পড়ে দো'য়া করো , পরীক্ষার ফল যেন ভালো হয়।

সাদিয়া আদরের প্রতিদান দিয়ে বলল, এতদিন তো তাই করে আসছি; আজও করব। আমার মন বলছে, ইনশাআল্লাহ ফলাফল খুব ভালো হবে।

জাকির তার ঠোঁটে কয়েকটা আদর দিয়ে বলল, এই ঠোঁটে আল্লাহপাকের রহমত বর্ষিত হোক।

সাদিয়াও স্বামীর ঠোঁটে কয়েকটা আদর দিয়ে স্বামীর কথাটা আবৃত্তি করল।

পরের দিন সকালে জাকির বড় ভাইকে বলল, আমি আজ মাঠে কাজ করতে যাব না। আমার পরীক্ষার ফল বেরোবে। নাস্তা খেয়ে বাজারে গিয়ে খবরের কাগজ কিনে আনব।

খলিল কিছু না বলে মাঠে চলে গেল।

পরীক্ষার ফলাফলের চিন্তায় জাকির সারারাত ভালো করে ঘুমাতে পারেনি। সাদিয়া তা বুঝতে পেরে অনেকবার তাকে দুঃশ্চিন্তা করতে নিষেধ করে প্রেম দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছে।

জাকির নাস্তা খেয়ে বাজারে যাওয়ার জন্য যখন তৈরি হল তখন সাদিয়া স্বামীকে কদমবুসি করে জড়িয়ে ধরে তার মুখে কয়েকটা আদর দিয়ে বলল, আপনি কোনো চিন্তা করবেন না। কাল রাতে বললাম না, ইনশাআল্লাহ আপনার পরীক্ষার ফল খুব ভালো হবে?

জাকির তাকে জাপটে ধরে আদরের প্রতিদান দিয়ে বলল, আল্লাহ তোমার কথা কবুল করুন। তারপর সালাম বিনিময় করে আল্লাহ হাফেজ বলে আম্মার কাছে গেল।

দিলারা খানম তখন নিজের ছেঁড়া জামাটা সেলাই করছিলেন। জাকিরকে দেখে বললেন, কোথায় যাবি? মাঠে যাবি না?

জাকির আম্মাকে কদমবুসি করে বলল, আজ পরীক্ষার ফল বেরোবে। তাই বাজারে যাচ্ছি। তুমি দো'য়া কর আম্মা।

দিলারা খানম তার মাথায় চুমো খেয়ে বললেন, আল্লাহ তোর মনের বাসনা পূরণ করুন।

জাকির আম্মার সঙ্গে সালাম বিনিময় করে বাজারে রওয়ানা দিল। সাদিয়া দরজার কাছ থেকে স্বামীর দিকে তাকিয়ে বিড় বিড় করে বলল, আল্লাহগো, তুমি আমার স্বামীকে নিরাশ করো না।

সাদিয়া ছোটবেলা থেকে ফুল ও আতর খুব ভালবাসে। অবশ্য এই গুনটা সে তার আব্বা ও আম্মার কাছ থেকে পেয়েছে। বিয়ের সময় নেসার ফকির মেয়েকে বেশ কিছু টাকা দিয়ে বলেছিলেন, জাকির এখন বেকার। এটা দিয়ে তোমার সখ সাধ মিটিও। তবে যা কিছু করবে স্বামীকে দিয়ে করাবে। সেই টাকা থেকে সে প্রায় স্বামীকে দিয়ে ফুল ও আতর কেনায়। জাকিরও এগুলো খুব ভালবাসে। টাকার অভাবে কিনতে পারত না। প্রথম যেদিন সাদিয়া কয়েকটা টাকা স্বামীর হাতে দিয়ে ফুল ও আতর কিনে আনার জন্য বলল তখন জাকির টাকা ফেরৎ দিয়ে বলল, এটা রাখ; আম্মার কাছ থেকে টাকা নিয়ে এনে দিচ্ছি।

সাদিয়া স্বামীর পকেটে টাকা গুঁজে দিয়ে তার দুটো হাত ধরে রেখে বলল, বেয়াদবি মাফ করুন, এসব কেনার জন্য ওঁর কাছে টাকা পয়সা চাইবেন না। আম্মা যে কত হিসাব করে সংসার চালান, তা আমি জানি। এসব কেনার জন্য আমার কাছে টাকা আছে।

টাকা যখন শেষ হয়ে যাবে?

শেষ হতে হতে ইনশাআল্লাহ আপনি রোজগার করতে শিখে যাবেন।

জাকির হেসে উঠে বলল, আমি তো এখনও ছাত্র। রোজগার করব কবে তার কোনো ঠিক আছে? অতদিন তোমার টাকা থাকবে?

সাদিয়া মৃদু হেসে বলল, থাকবে।

তা হলে তো তোমার অনেক টাকা?

অনেক হোক আর যাই হোক, আপনার প্রয়োজন হলে ইচ্ছামতো নিতে পারেন।

বিয়ে করার পর থেকে তোমাকে কিছু দিতে পারিনি। এমনি মনে কত অশান্তি। তার উপর যদি তোমার টাকা নিই, তা হলে সেই অশান্তি আরও বেড়ে যাবে।

সাদিয়া বসে পড়ে স্বামীর দু'পা জড়িয়ে ধরে চোখের পানি ফেলতে ফেলতে বলল, আপনার কাছে আমি টাকা-পয়সা, সোনাদানা, বালাখানা কিছুই চাই না। শুধু আপনার প্রেম চাই। আর কখনও ঐ কথা চিন্তা করবেন না বলুন?

জাকির তাকে তুলে বুকে জড়িয়ে বলল, ঠিক আছে, আর করব না।

সাদিয়া নিজেকে মুক্ত করে কাপড়ে জড়ান টাকার পুটলিটা তার হাতে দিয়ে বলল, এটা আব্বা আমাকে হাত খরচের জন্য দিয়েছিলেন। এখন আমি আপনার হাত খরচের জন্য দিলাম। না নিলে মনে কষ্ট পাব।

জাকির পুটলিটা নিয়ে বলল, এটা এখন আমার। এটাকে আমি যা খুশি তাই করতে পারি। তাতে তোমার কোনো আপত্তি নেই তো?

সাদিয়া বলল, না।

জাকির পুটলিটা সাদিয়ার হাতে ফেরৎ দিয়ে বলল, এটা আমার স্ত্রীর কাছে জমা রাখলাম। দরকারমতো খরচ করব। আর তোমাকেও এর থেকে খরচ করার অধিকার দিলাম। তারপর তাকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে বেরিয়ে গেল।

আজ জাকির পরীক্ষার ফল জানার জন্য বাজারে চলে যাওয়ার পর সাদিয়া শাশুড়ীর কাছে এসে তার হাতে কয়েকটা টাকা দিয়ে বলল, আম্মা কাউকে দিয়ে কিছু ফুল কিনে আনার ব্যবস্থা করুন। আপনার ছেলেকে বলতে ভুলে গেছি।

দিলারা খানম সাদিয়ার চাল-চলন, আচার-ব্যবহার ও ইবাদত-বন্দেগী দেখে শুনে বুঝতে পেরেছেন, সে বাপের মতো নেকবক্ত মেয়ে। তাই সব সময় অযু অবস্থায় থাকে। তার শরীর থেকে সর্বদা আতরের সুগন্ধ বেরোয়। আর তার ঘরে ঢুকলে আতর গোলাপ ও ফুলের খশবুতে দীল মোহিত হয়ে যায়। একদিন জাকিরকে জিজ্ঞেস করলেন, ছোট বৌ এত আতর গোলাপ ও ফুল পায় কোথায়? তুই কি এনে দিস?

জাকির বলল, হ্যাঁ আম্মা, আমি এনে দিই ঠিক; তবে টাকা তোমার বৌ দেয়। আমি টাকা পাব কোথায়?

তাই আজ যখন সাদিয়া ফুল আনিয়ে দেয়ার কথা বলে দিলারা খানমকে টাকা দিল তখন বললেন, ঠিক আছে, আমি সে ব্যবস্থা করছি।

কাগজে পরীক্ষার রেজাল্ট দেখে আনন্দে জাকিরের চোখে পানি এসে গেল। সে বাণিজ্য বিভাগ নিয়েছিল। ঐ বিভাগে ফার্স্টক্লাশ ফার্স্ট হয়েছে। পরীক্ষা ভালই দিয়েছিল;

কিন্তু রেজাল্ট এত ভালো হবে আশা করেনি। তাই প্রথমে সে প্রথম ও দ্বিতীয় ক্লাসে নাম্বার না পেয়ে ভীষণ হতাশ হয়ে পড়ে। পরে অনিচ্ছা সত্বেও যারা স্ট্যান্ড করেছে তাদের নাম্বার দেখতে গিয়ে প্রথমেই তারটা দেখে আনন্দে আপনা থেকে চোখ দু'টো পানিতে ভরে উঠে। আল্লাহপাকের শুকরিয়া আদায় করার জন্য বাজারের মসজিদে গিয়ে দু'রাকায়াত শোকরানার নামায পড়ে দো'য়া করল, "হে গফুরুর রহিম, তোমার অসীম করুনায় যেভাবে এই পরীক্ষায় উর্ত্তীণ হয়েছি, ভবিষ্যতে সব পরীক্ষায় যেন সেইরূপ উত্তীর্ণ হতে পারি। আর আমাকে ও সাদিয়াকে তোমার নেক বান্দাদের সামিল করে ইহকাল ও পরকালে সুখ শান্তি দান কর। তোমার পেয়ারা হাবিব (দঃ) এর উপর শত কোটি দরুদ ও সালাম পেশ করে ফরিয়াদ করছি, তুমি আমার দোয়া কবুল কর।" মোনাজাতের পর মসজিদ থেকে বেরিয়ে ফুলের দোকানে ফুল কেনার জন্য গেল। আজ সে মায়ের কাছ থেকে কিছু টাকা নিয়ে এসেছে।

এই দোকান থেকে জাকির সব সময় ফুল কিনে। এক গুচ্ছ রজনীগন্ধা ও একটা লাল গোলাপ কিনে ময়রার দোকানে গিয়ে কিছু মিষ্টি কিনল। তারপর যখন সে বাড়ি ফিরল তখন বেলা প্রায় বারটা। তখনও খলিল মাঠে। তাই আম্মাকে ও ভাবিকে সালাম করে বলল, আল্লাহর রহমতে আমি ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট হয়ে পাশ করেছি।

দিলারা খানম শোকর আলাহামদু লিল্লাহ বলে জাকিরকে জড়িয়ে ধরে তার মাথায় ও দু'গালে চুমো খেয়ে বললেন, আল্লাহ তোকে আরও কামিয়াব করুক, তোর হায়াতে তৈয়েবা দিক।

জাকিরের বড় ভাই খলিলের দু'মেয়ে এক ছেলে। মেয়ে দু'টো বড়। নাম তাহমীনা ও আফরোজা। ছেলের নাম সাজ্জাদ। সবার বড় তাহমীনা সিক্সে পড়ে। আফরোজা ফোরে আর সাজ্জাদ কোলের শিশু। আফরোজা স্কুলে গেছে। তাহমীনার শরীর খারাপ। তাই আজ যাইনি। সে চাচার পাশের খবর শুনে বলল, চাচা আপনি পাশ করেছেন, আমাদেরকে মিষ্টি খাওয়াবেন না?

জাকির বলল, হ্যাঁ মা খাওয়াব। সেই জন্যে তো এটা নিয়ে এলাম বলে মিষ্টির প্যাকেটটা ভাবির হাতে দিয়ে বলল, সবাইকে মিষ্টি খাওয়াও। এই কথা বলে নিজের রুমের দিকে এগোল।

জাকির রুমে ঢুকে সালাম দিয়ে সাদিয়াকে দু'হাতে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরে তার সারা মুখে কিছুক্ষণ পাগলের মতো চুমো খেল। তারপর ঠোঁটে ঠোঁট রেখে বলল, আল্লাহপাক এই ঠোঁটের দো'য়া কবুল করে তোমার আমার মনস্কামনা পূরণ করেছেন। এমন শুভক্ষণে তোমাকে অনেক কিছু দেয়ার ইচ্ছা থাকা সত্বেও পারছি না। সেজন্যে মনের মধ্যে কাঁটার মতো বিঁধছে। তাই এই সামান্য তোফা গ্রহণ করে সেই কাঁটার বেদনা থেকে শান্তি দাও। তারপর ফুলের গোছাটা তার হাতে দিয়ে গোলাপ ফুলটা চুলে গুঁজে দিল।

সাদিয়া যে ফুল কিনে ছিল, তা দিয়ে একটা মালা তৈরি করে রেখেছিল। সেটা নিয়ে তার গলায় পরিয়ে দিয়ে বলল, আমার তো নিজস্ব কিছু নেই, যে দেব। যা কিছু

ছিল, তা অনেক আগে আপনার পায়ে সোপর্দ করে দিয়েছি। তাই দাসীরও এই নগন্য তোফা গ্রহণ করে ধন্য করুণ। আর যে টুকু নিজের দেয়ার মত আছে, তা দিচ্ছি। এই কথা বলে স্বামীর মুখে অসংখ্যবার চুমো খেতে লাগল।

জাকির তার প্রতিদান দিতে দিতে বলল, তুমি ফুলের মালা পেলে কোথায়?

সাদিয়া বলল, আপনি চলে যাওয়ার পর ফুলের কথা মনে পড়ল। শেষে আম্মাকে বললাম। উনি আনিয়ে দিয়েছেন।

জাকির বলল, জান সাদিয়া, আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করে শেষ করতে পারব না। পরীক্ষা ভালো দিয়েছিলাম ঠিক; কিন্তু রেজাল্ট এত ভালো হবে কল্পনা করি নাই। এটা হয়েছে তোমার মতো আল্লাহ পাকের খাসবান্দীর দো'য়ার বরকতে।

সাদিয়া বলল, আল্লাহপাকের খাসবান্দী হতে পারলে ধন্য হয়ে যেতাম। আপনার শ্রম ও আল্লাহপাকের উপর তাওয়াক্কুলের জন্য এটা সম্ভব হয়েছে। এমন সময় তাহমীনা মিষ্টি নিয়ে এসে বারান্দা থেকে বলল, চাচা, আমি আপনাদের জন্য মিষ্টি এনেছি।

জাকির সাদিয়াকে ছেড়ে দিয়ে বলল, আয় ভিতরে নিয়ে আয়।

তাহমিনা ঘরে ঢুকে মিষ্টির বাটিটা রেখে চলে যেতে উদ্যত হলে জাকির বলল, তুই খেয়েছিস?

তাহমিনা হ্যাঁ খেয়েছি বলে চলে গেল।

ঐদিন রাতে খাওয়ার সময় খলিল জাকিরকে বলল, পাশ তো করলি, এবার কি করবি ভেবেছিস? বিয়ে করে সংসারের খরচ বাড়িয়েছিস। তোকে আর পড়াশোনা করাবার মতো সামর্থ নেই।

জাকির বলল, ভাবছি ঢাকায় গিয়ে কিছু একটা করতে পারলে পড়াশোনাটাও চালিয়ে যাব।

খলিল বলল, যা ভালো বুঝিস কর।

জাকির বলল, ভাইয়া, আমার শ্বশুর বলেছিলেন, পরীক্ষার ফল বেরোবার পর ওঁর সঙ্গে দেখা করতে। তোমাদের ছোট বৌকে নিয়ে কাল পরশু আমি সমেশপুর যেতে চাই।

দিলারা খানমও সেখানে ছিলেন। খলিল মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, আম্মা, তুমি কি বল?

দিলারা খানম বললেন, বিয়াই সাহেব যখন যেতে বলেছেন তখন ও যাক। আর ছোট বৌ অনেক দিন হল নতুন এসেছে, তাকেও নিয়ে যাক; কয়েকদিন ঘুরে আসুক।

জাকির একবার ভাবল, সাদিয়ার প্রতি ভাবির কথাটা তুলবে। আবার ভাবল, সমেশপুর থেকে ফিরে এসে বলবে। শেষমেষ কথাটা আর তুলল না।

পরের দিন জাকির সাদিয়াকে সঙ্গে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি গেল।

পরীক্ষার রেজাল্ট শুনে নেসার ফকির আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে জামাইকে জিজ্ঞেস করলেন, রেজাল্ট খুব ভালো করেছ, আরও পড়াশোনা করতে চাও নিশ্চয়?

জাকির বলল, জী, আমার খুব ইচ্ছা অন্তত এম.এ. পর্যন্ত পড়ব; তবে সেই সঙ্গে কিছু উপার্জন করার চেষ্টাও করতে হবে।

নেসার ফকির বললেন, পড়াশোনা করবে ভালো কথা; কিন্তু আমার মতে তোমাদের সংসারের যা অবস্থা, তাতে করে তোমার আর পড়াশোনা করার দরকার নেই; কিছু ব্যবসা পাতি কর। ব্যবসায় আল্লাহপাক বরকত রেখেছেন?

জাকির বলল, কিন্তু ব্যবসা করার মতো আমাদের তো টাকা নেই?

নেসার ফকির বললেন, তুমি খালেস দীলে নিয়েত কর। পূরণ করার মালিক আল্লাহ। চাকরি করার কথা মন থেকে মুছে ফেল। লেখাপড়া করার উদ্দেশ্য চাকরি নয়; বরং জ্ঞান অর্জন করা এবং সেই জ্ঞানের অনুস্বরণ করা। আজকাল চাকরির টাকায় মাসের অর্ধেক দিন চলে না। সবাই অসৎ উপায়ে উপরি রোজগার করে। তাদের এবাদৎ আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না। আজকাল শতকরা নিরানব্বই জন লোক অসৎ উপায়ে যা রোজগার করছে, তা হারাম। সেই হারাম খেয়ে যে ছেলেমেয়ের জন্ম দিচ্ছে, তারা কোনো দিন ধার্মিক বা চরিত্রবান হতে পারে না। আজকাল কেউ হালাল হারামের বাদ বিচার করছে না বলে সমাজের ছেলে মেয়েদের এত অবক্ষয় বেড়ে চলেছে। যাক, ওসব কথা থাক। তুমি ব্যবসা করার চিন্তা ভাবনা কর। একটা কথা সব সময় খেয়াল রাখবে, যা কিছু করবে তা ইসলামের আইনের কষ্টি পাথরে যাঁচাই করে করবে। আর টাকা পয়সার কথা যে বললে, সে চিন্তা তুমি করো না। আল্লাহপাকের উপর ভরসা করে কাজে নাম, যতটুকু পারি আমি সাহায্য করব।

জাকির বলল, আমি আম্মা ও ভাইয়ার সঙ্গে পরামর্শ করে আপনাকে জানাব।

নেসার ফকির বললেন, বেশ, তাই করো।

পাঁচদিন শ্বশুর বাড়িতে ও দু'দিন বড় বোনের বাড়িতে থেকে জাকির সাদিয়াকে নিয়ে বাড়ি ফিরে এল। সেইদিন রাতে আম্মাকে ও ভাইয়াকে ব্যবসা করার কথা জানাল।

খলিল হেসে উঠে বলল, তুই হাসালি। আজকাল যে কোনো ব্যবসা করতে হলে অনেক টাকার দরকার। এমনই আমাদের সংসার কত কষ্টের সাথে চলছে। ব্যবসা করার কথা চিন্তা করাই বোকামী। ওসব চিন্তা বাদ দিয়ে সেদিন যা বললি তাই কর। ঢাকায় গিয়ে চাকরির চেষ্টা কর।

জাকির তখন আর কিছু বলল না। পরে এক সময় মাকে শ্বশুরের কথা বলল।

দিলারা খানম কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, তোর শ্বশুর যখন বলেছেন তখন আর কি করবি? বাজারে কয়েকজন ব্যববসায়ীর কাছে আলাপ করে দেখ, তারা কি বলেন। তারপর বিয়াই সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ কর। এ ব্যাপারে এখন খলিলকে কিছু বলার দরকার নেই।

জাকির কয়েকদিন ধরে বাজারে গিয়ে কয়েকজন বড় বড় ব্যবসায়ীদের কাছে কি ব্যবসা এখানে ভালো চলবে আলাপ আলোচনা করে জানতে পারল, ধান চালের অথবা পাটের ব্যবসা ভালো চলবে। একদিন সমেশপুরে গিয়ে শ্বশুরের সঙ্গে দেখা করে আম্মার মতামত জানিয়ে ব্যবসার কথা বলল।

নেসার ফকির তার হাতে কাপড়ে জড়ান বেশ কিছু টাকা দিয়ে বললেন, এটা দিয়ে প্রথমে ধান চালের আড়ৎ দাও। লাগলে পরে আরও দেব। যা কিছু করবে তোমার আম্মার সঙ্গে পরামর্শ করে করবে। আমি যে টাকা দিচ্ছি, তা তোমার আম্মাকে ছাড়া আর কাউকে জানাবে না। তোমার আম্মার কথার কখনও অবাধ্য হয়ো না। বড় ভাই-ভাবিকে সম্মান করবে। তাদের মনে কষ্ট দিও না। তারা তোমাদের যতই দোষারূপ করুক না কেন, তোমরা তাদেরকে যতটা পার সাহায্য করবে।

জাকির শ্বশুরকে কদমবুসি করে বলল, আপনি দো'য়া করুন, আমি যেন আপনার কথামত চলতে পারি। তারপর সে বাড়ি ফিরে এসে সেইদিন রাতে মাকে শ্বশুরের সব কথা ও টাকা দেয়ার কথা বলে তার পরামর্শ চাইল।

দিলারা খানম বললেন, তোর শ্বশুর আল্লাহওয়ালা ও বিচক্ষণ লোক। উনি যা বলেছেন, সেইমতো কাজ কর। আমার দো'য়া তোদের উপর সব সময় থাকবে।

জাকির বলল, একটা কথা তোমাকে বলি বলি করেও বলা হয়নি। এই সব ব্যাপারে ব্যস্ত থাকায় মনেও থাকে না। আমি ভাইয়া ও ভাবিকে বলতে গেলে ঝগড়ার সৃষ্টি হবে। তাই তুমি এর একটা ফায়সালা করবে।

দিলারা খানব বললেন, কি এমন ব্যাপার বলতো শুনি।

জাকির সাদিয়ার প্রতি ভাবির ব্যবহারের কথা বলল।

দিলারা খানম বেশ অবাক হয়ে বললেন, তাই নাকি? কই, আমি তো কিছুই জানি না? তারপর সাদিয়াকে ডেকে বললেন, এতদিন হয়ে গেল, তুমি আমাকে জানাওনি কেন?

সাদিয়া কোনো কথা না বলে চুপ করে রইল।

তাই দেখে জাকির বলল, আমি সেকথা ওকে জিজ্ঞেস করতে বলল, সংসারে অশান্তি হবে। সেই কথা ভেবে আমাকেও জানাইনি। একদিন রাতে কাঁদতে দেখে অনেকবার জিজ্ঞেস করতে তবে বলে।

দিলারা খানম বললেন, ঠিক আছে, আমি এ ব্যাপারে খলিলের সঙ্গে কথা বলব। তারপর সাদিয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন, কাল থেকে তুমি সংসারের কাজ কাম করবে। দেখব বড়বৌ কি বলে। এখন তোরা যা শুয়ে পড়, রাত হয়েছে।

পরের দিন সকালে সাদিয়া যখন থালা বাসন মাজার জন্য গোছাচ্ছিল তখন নিহারবানু সেখানে এসে তার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে নিজে মাজতে বসল। তারপর বেশ রাগের সাথে বলল, এতদিন যখন করনি তখন আজ আবার করতে এসেছ কেন?

সাদিয়া বলল, কেন আমি করতে পারব না? আমিও তো এই সংসারের একজন। সব কিছু করার অধিকার আমারও আছে।

নিহারবানু এতদিন ছোট জাকে কোনো প্রতিবাদ করতে দেখেনি। আজ তার কথা শুনে বেশ অবাক হয়ে রাগের চোটে বলে ফেলল, এবারে বাপের বাড়ি থেকে এসে ফকিরের মেয়ের মুখে কথা ফুটেছে দেখছি। বাপ মা বুঝি শিখিয়ে দিয়েছে?

সাদিয়া ঝগড়ার ভয়ে কোনো দিন প্রতিবাদ করেনি। গতরাতে শাশুড়ীর কথায় সাহস পেয়ে ঐ কথা বলেছে। এখন বড় জায়ের কথা শুনে মনে কষ্ট পেয়ে চোখ মুছতে মুছতে সেখান থেকে চলে আসতে লাগল।

দিলারা খানম এতক্ষণ দূর থেকে তাদের সবকিছু দেখছিলেন। সাদিয়াকে চলে যেতে দেখে এগিয়ে এসে গম্ভীর স্বরে বললেন, ছোটবৌ দাঁড়াও। তারপর বড় বৌকে বললেন, তুমি ওকে কোনো কাজ করতে দাও নি কেন? ওকি এ বাড়ির বৌ না?

নিহারবানু বলল, ও আসার আগে আমিই তো এতদিন সব কাজ করে এসেছি।

দিলারা খানম বললেন, এতদিন ও ছিল না। এখন যখন আছে তখন দু'জনে করবে। আর তুমি ছোট বৌকে ফকিরের মেয়ে বললে কেন? তোমার তো সাহস কম না? জেনে রেখ, ছোট বৌয়ের বাপ আল্লাহ'র ফকির, অর্থসম্পদের নন। তোমার বাপের চেয়ে ওর বাপের অনেক টাকা পয়সা আছে। আর কখনও বলবে না।

নিহারবানু রাগের সঙ্গে বলল, ওর বাপের টাকা পয়সা থাকলে, ফকিরের মতো থাকে কেন? শুনেছি কোনো কাজ কাম করে না, ঘুরে ঘুরে ভিক্ষে করে সংসার চলায়।

দিলারা খানম গর্জে উঠে বললেন, মুখ সমালে কথা বল। কার সম্বন্ধে কি বলতে হয় তা তোমার বাপ মা শিক্ষা দেয় নাই। ওঁর সম্পর্কে আর একটা কথা বলবে না।

নিহারবানু বলল, আমি না বললেও দুনিয়া শুদ্ধ লোক তাই বলে।

সাদিয়া শাশুড়ীর হাত ধরে টেনে নিয়ে যেতে যেতে বলল, ঘরে চলুন আম্মা। বুবুর সঙ্গে কথা বলা বৃথা। উনি আপনার কথা বুঝবেন না।

নিহারবানু শাশুড়ীকে উদ্দেশ্য করে বলল, এই মেয়ে তো মানবী নয়, পরী। ওর বাপ পরীকে বিয়ে করে যাদু শিখেছে। সে আপনাদের সবাইকে যাদু করেছে। আমার কথা আপনাদেরকে ভালো লাগবে কেন? এই মেয়েও যে পরীর পেটের পরী, আমি তাহমীনার বাপকে তা অনেকবার প্রমাণ দেখিয়েছি। সেও ওকে তাই ভাবে। আমার সাফ কথা, ওকে নিয়ে আমি এক সংসারে থাকব না। আর তা না হলে, হয় ও থাকবে নচেৎ আমি থাকব।

দিলারা খানম দাঁড়িয়ে পড়ে রাগে কাঁপতে কাঁপতে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন; সাদিয়া ওঁকে জড়িয়ে ধরে জোর করে ঘরে নিয়ে যেতে যেতে বলল, আপনি উত্তেজিত হবেন না। ডাক্তার আপনাকে উত্তেজিত হতে নিষেধ করেছেন।

দিলারা খানমের কিছুদিন থেকে হার্টের অসুখ দেখা দিয়েছে। একটু কিছুতে বুক ধড়ফড় করে। মাথা ঘুরতে থাকে। গ্রামদেশে ভালো ডাক্তার নেই। একজন মাত্র এম.বি.বি.এস. আছেন। তার বিজুট অনেক। অন্যান্য যারা আছেন, তারা পাশ না করে পাশ করা ডাক্তার লিখে সাইন বোর্ড লাগিয়ে ডাক্তারী করছে। জাকির বড় ভাইয়ের পরামর্শ নিয়ে পাশ করা ডাক্তারকে দিয়ে মায়ের চিকিৎসা করাচ্ছে।

সাদিয়া শাশুড়ীকে ঘরে নিয়ে এসে বিছানায় শুয়ে দিল। তারপর নারকেল তেলের সাথে পানি মিশিয়ে মাথার চাঁদিতে দিয়ে পাখার বাতাস করতে লাগল।

দিলারা খানমের তখন বুকের ব্যথাটাও বেড়েছে। বললেন, ছোটবৌ, বুকে একটু তেল মালিশ করে দাও তো।

সাদিয়া সরিষার তেল নিয়ে এসে মালিশ করে দিতে লাগল।

এক সময় দিলারা খানম ঘুমিয়ে পড়লেন।

খলিল দুপুরে ভাত খাওয়ার সময় স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করল, আম্মাকে দেখছি না কেন?

নিহারবানু বলল, আম্মার শরীর খারাপ শুয়ে আছে।

জাকির কোথায়?

তার কথা আমি জানব কেমন করে? সে তো বৌ ঘরে আনার পর থেকে গায়ে হাওয়া দিয়ে বেড়ায়। চাষ বাসের কাজ করতে হয়তো তার সম্মানে বাধে।

এমন সময় জাকিরকে ফিরতে দেখে খলিল তাকে বলল, তুই ঢাকায়ও যাচ্ছিস না, আর কোনো কাজ কামও করছিস না, সারাদিন কোথায় থাকিস?

জাকির বলল, ঢাকায় আর যাব না, এখানেই কিছু করার চেষ্টা করছি। সেই ব্যাপারে অনেকের কাছে ছুটাছুটি করতে হচ্ছে। কথা শেষ করে সে নিজের ঘরে চলে গেল।

সাদিয়া শাশুড়ীর ঘরে ছিল। স্বামী ফিরেছে জানতে পেরে নিজের ঘরে এসে তার সঙ্গে সালাম বিনিময় করল। তারপর বলল, আম্মার শরীর খারাপ, বুকের ব্যাথাটা বেড়েছে।

জাকির তাকে সঙ্গে নিয়ে মায়ের ঘরে এসে দেখল, সে উঠে বসেছে। সালাম দিয়ে বলল, এখন কেমন আছ আম্মা?

দিলারা খানম সালামের উত্তর দিয়ে বললেন, ব্যথাটা একটু কমেছে। তারপর কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে বললেন, তুই তো এখনও খাসনি? যা, ছোটবৌকে নিয়ে খেতে যা।

সাদিয়া বলল আম্মা আপনিও চলুন। সকাল থেকে তো কিছু খাননি।

জাকির স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি খেতে দাওনি?

সাদিয়া বলার আগে দিলারা খানম বললেন, শরীর খারাপ বলে আমিই খাইনি।

এমন সময় খলিল খেয়ে উঠে মায়ের ঘরে এসে বলল, আম্মা, তোমার নাকি সকাল থেকে শরীর খারাপ? ওষুধগুলো কি ঠিক মতো খাচ্ছ না?

দিলারা খানম গম্ভীরস্বরে বললেন, ওসব নিয়ে তোকে ভাবতে হবে না। বড়বৌ যে এক সংসারে থাকতে চাচ্ছে না, সে কথা তোকে বলেছে?

খলিল আমতা আমতা করে বলল, কয়েকদিন আগে দু'একবার বলেছিল; তবে তার কথা আমি গ্রাহ্য করিনি।

দিলারা খানম বললেন, তুই তোর মনের কথা খোলাখুলি বলতে পারছিস না কেন? মায়েরা ছেলেমেয়েদের মনের খবর বুঝতে পারে। তুই ও তোর বৌ যে ছোটবৌকে পছন্দ করিস না, তা আমি অনেক আগেই বুঝেছি। তবু চুপ করে ছিলাম। মনে করেছিলাম, তোদের ভুল ভাঙ্গলে তোরা ছোটবৌকে কাছে টেনে নিবি; কিন্তু তোদের ভুল ভাঙ্গল না। তোরা তাকে পরী ভেবে দূরে ঠেলে রেখেছিস। আজ তোর বৌয়ের কথা শুনে বুঝতে পারলাম, কোনোদিন তোদের ধারণা পাল্টাবে না আর ছোটবৌকে কাছে টেনেও নিবি না। বড়বৌ বেশ কিছুদিন থেকে ছোটবৌকে সংসারের কোনো কাজ করতে দেয় না। সে কথা জিজ্ঞেস করতে স্পষ্ট জানিয়ে দিল, সে আর ছোটবৌকে নিয়ে

এক সংসারে থাকবে না। তাই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আজই তোদের দু'ভাইয়ের সংসার আলাদা করে পানি খাব।

খলিল ছোট ভাই ও তার বৌয়ের উপর অসন্তুষ্ট হলেও এবং সংসার আলাদা করে নিতে চাইলেও, আম্মা মনে কষ্ট পাবে ভেবে এতদিন স্ত্রীর কথা গ্রাহ্য করেনি। এখন মায়ের কথা শুনে ভাবল, এটাই আলাদা হওয়ার ভাল সুযোগ। বলল, তুমি যখন আলাদা না করে পানি খাবে না বলছ তখন আমি আর কি বলব? তুমি যা ভালো বুঝ. কর। তারপর মায়ের দু'পা জড়িয়ে ধরে ভিজে গলায় বলল, তুমি আমাদের উপর মনে কষ্ট নিও না আম্মা। আমাদেরকে মাফ করে দাও। তোমাদের বড়বৌ কি ধরণের মেয়ে তাতো তুমি জান।

দিলারা খানমের চোখ থেকে পানি গড়িয়ে পড়ল.। তার মাথায় হাত বুলিয়ে চুমো খেয়ে বললেন, আল্লাহ সবাইকে মাফ করুক। মায়েরা কি ছেলেদের অন্যায় মনে রাখে?

সেই দিনই দিলারা খানম দু'ছেলের সংসার আলাদ করে দিলেন। তিনি জাকিরের সংসারে রইলেন।

জাকির এনায়েতপুর বাজারে প্রথমে ধান চালের পাইকারী ব্যবসা শুরু করে বছর দু'য়েকের মধ্যে বেশ উন্নতি করল। তার খুব ইচ্ছা পাটের ব্যবসা করার। কিন্তু টাকার কথা ভেবে মনের ইচ্ছা মনে গোপন করে রাখল।

একদিন রাতে ঘুমাবার সময় সাদিয়া স্বামীকে বলল, আমি কয়েকদিন থেকে লক্ষ্য করছি, আপনি যেন কিছু একটা বিষয় নিয়ে চিন্তা করছেন।

জাকির বেশ একটু অবাক হয়ে জড়িয়ে ধরে আদর করতে করতে বলল, আল্লাহ যাকে এমন পূন্যবতী স্ত্রী দান করে সৌভাগ্যবান করেছেন, তার আবার চিন্তা করার কি আছে?

সাদিয়া আদরের প্রতিদান দিয়ে বলল, আমি কিন্তু ঐসব উদ্দেশ্য করে বলিনি।

তাহলে তোমার উদ্দেশ্যটা বল।

মনে হচ্ছে ব্যবসায়ীক ব্যাপার নিয়ে আপনি চিন্তা করছেন।

তা অবশ্য করছি।

আমাকে একটু ছাড়ুন তো।

কেন বললে তবে ছাড়ব।

বলব তো নিশ্চয়; তার আগে আমাকে উঠে বসতে হবে।

জাকির ছেড়ে দিতে সাদিয়া উঠে বসল। তারপর তক্তপোষ থেকে থেমে নিজের সুটকেশ খুলে একটা পুটলি বের করে এনে তার হাতে দিয়ে বলল, এগুলো আম্মার গহণা। বিয়ের সময় আম্মা আমাকে দিয়েছিলেন। আমি পারিনি। এগুলো বিক্রি করে ব্যবসাতে লাগান।

জাকির খুব অবাক হয়ে বলল, আমার যে টাকার দরকার, তা তোমাকে কে বলল?

কেউ না বললেও আমি বুঝতে পেরেছি। টাকা পেলে আপনি ব্যবসাটা আরও বড় করতে পারবেন।

জাকির আরও অবাক হয়ে বলল, কি করে তা বুঝলে?

সাদিয়ার মুখ থেকে হঠাৎ করে বেরিয়ে গেল, আল্লাহপাকের ইচ্ছায় আমি আরও অনেক কিছু বুঝতে পারি।

জাকির আরও বেশি অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, কিন্তু কেমন করে বুঝতে পার বলবে তো?

সাদিয়া নিজের ভুল বুঝতে পেরে বুদ্ধি খাটিয়ে বলল, আপনার মুখের দিকে তাকিয়ে মনের খবর বলতে পারি। তা ছাড়া স্ত্রী হয়ে যদি স্বামীর মন বুঝতে না পারি,

তা হলে স্ত্রী হলাম কেন? যারা তা পারে না অথবা পারার চেষ্টা করে না, তারা স্ত্রী হওয়ার অযোগ্য।

জাকির বলল, তুমি খুব খাঁটি কথা বলেছ। তবে স্বামীদেরও তাই কর উচিত। নচেৎ তারাও স্বামী হওয়ার অযোগ্য।

সাদিয়া বলল, আপনার কথাটাও খুব দামী। কিন্তু কয়জন স্বামী-স্ত্রী সেদিকে খেয়াল করে? থাক এসব কথা, এখন যা বললাম, তা করতেই হবে।

জাকির বলল, কিন্তু আম্মার দেয়া গহণা আমাকে দিচ্ছ কেন? এমনি আমি তোমাকে কিছুই দিতে পারি নি। না না, এগুলো রেখে দাও; আমি নিতে পারব না। আল্লাহ যখন এতটা সাহায্য করেছেন তখন সামনে আরও করবেন।

সাদিয়া বলল, এগুলো আম্মার হলেও এখন আমার। আল্লাহপাক আমাকে যখন আপনাকে দান করেছেন তখন আমি ও আমার সবকিছু আপনার। আমাকে গ্রহণ করেছেন; আমার জিনিস গ্রহণ করবেন না কেন? আমার সমস্ত কিছু আপনার পবিত্র কদমে উৎস্বর্গ করেছি। আমি আপনার কোনো কথা শুনব না; দাসীর অনুরোধ আপনাকে রাখতেই হবে। আপনি দ্বিধা করছে কেন? স্ত্রীর সব কিছুর পূর্ণ অধিকার আল্লাহপাক স্বামীকে দিয়েছেন।

জাকির বলল, তোমার কথা ঠিক; কিন্তু স্ত্রীর দু'টো জিনিসের উপর স্বামীর পূর্ণ অধিকার নেই। তার একটা হল, দেন মোহর বাবদ সে যা পায়। আর অন্যটা হল, স্ত্রী মা বাপের কাছে থেকে যা পায়। এটা হাদিসের কথা।

সাদিয়া বলল, এই হাদিস আমি ও জানি। কিন্তু হাদিসে আরও আছে, স্ত্রী যদি খুশি মনে স্বেচ্ছায় সেসব স্বামীকে দেয়, অ হলে গ্রহণ করতে পারে। যে স্ত্রী তা করে থাকে, তার প্রতি আল্লাহ ও তাঁর রসুল (দঃ) সন্তুষ্ট হন। আমি তাঁদের সন্তুষ্টীর জন্য দিচ্ছি।

স্ত্রীর কথা শুনে জাকিরের একটা হাদিস মনে পড়ল। রসুল (দঃ) বলেছেন, "আল্লাহপাক বলেন, যাকে আমি অনেক ধন সম্পদ দান করেছি সে সৌভাগ্যবান নয়, বরং সেই সৌভাগ্যবান, যে নাকি ধার্মিক স্ত্রী পেয়েছে।"

হাদিসটা মনে পড়তে সাদিয়ার কথা ভেবে জাকিরের চোখে পানি এসে গেল। তাকে আলিঙ্গনবদ্ধ করে ভিজে গলায় আল্লাহপাকের শুকরিয়া আদায় করে বলল, তোমাকে পেয়ে আমি যে কত সুখী, তা বোঝাতে পারব না।

স্বামীর কথায় আনন্দে সাদিয়ার চোখেও পানি এসে গেল। সেও ভিজে গলায় বলল, আমিও সেই আল্লাহপাকের শুকরিয়া জানাচ্ছি, যিনি আমার দ্বারা আপনার মন আনন্দে ভরিয়ে দিয়েছেন। তারপর বলল, কালকেই এগুলো বিক্রি করে ব্যবসাতে লাগাবে।

জাকির বলল, কয়েকদিন থেকে চিন্তা করছিলাম, কিছু টাকা পেলে পাটের ব্যবসাতে নামতাম। আল্লাহপাক দয়া করে আমার সেই বাসনাও পূরণ করালেন তাঁর এই প্রিয় বান্দির মারফত। কথা শেষ করে তার নরম তুল তুলে ঠোঁটে কামড়ে দিল।

সাদিয়া স্বামীকে জড়িয়ে ধরে বলল, এই দুষ্টু কি হচ্ছে? আমার কষ্ট হয় না বুঝি?

জাকির বলল, আনন্দের সঙ্গে একটু কষ্ট না হলে যে নিরামীষ নিরামীষ লাগে।

তা হলে আমিও.....বলে সাদিয়া লজ্জায় কথাটা শেষ করতে না পেরে স্বামীর বুকে মুখ লুকাল।

জাকির সাদিয়ার গহনা বিক্রি করে পাটের ব্যবসা শুরু করল। বড় ভাইকে ধান চালের আড়তে বসিয়ে নিজে পাটের ব্যবসা দেখাশোনা করতে লাগল। আল্লাহর রহমতে ছয় সাত বছরের মধ্যে জাকির খুব উন্নতি করল। ব্যবসাপত্র যেমন বাড়াল তেমিন জমি জায়গা কিনল। বাড়িঘর নতুন করে তৈরী করল। সেই সাথে বড় ভাইকে নিজের ব্যবসায় লাগিয়ে তাদের সংসারের সব খরচ বহন করছে। ভাইপো ভাইজীদের লেখাপড়ার খরচ চালাচ্ছে। তাহমীনা ম্যাট্রিক পাশ করার পর তার বিয়ে দিয়েছে। আফরোজা ক্লাস সেভেনে আর সাজ্জাদ থ্রিতে পড়ছে। মাকে ঢাকায় এনে একজন বড় হার্ট স্পেসালিষ্টিকে দিয়ে চিকিৎসা করাচ্ছে। নিজের খরচায় গ্রামে একটা দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করছে। মসজিদ ও মক্তবের মাসিক সাহায্য করছে।

দিলারা খানম ছেলের উন্নতি ও কাজকর্ম দেখে ভাবেন, এতকিছুর পিছনে আল্লাহপাকের রহমত আর নেসার ফকিরের প্রচেষ্টা রয়েছে। আর সাদিয়ার সেবা যত্নে তিনি খুব সন্তুষ্ট। পাঁচওয়াক্ত নামায়ের পর ছোট ছেলে ও ছোট বৌয়ের জন্য দো'য়া করেন। এতকিছুর পরও দিলারা খানমের মনে শান্তি নেই। জাকিরের বিয়ে হয়েছে প্রায় সাত আট বছর। কিন্তু এতদিনেও তাদের কোনো আওলাদ হচ্ছে না কেন? এই চিন্তাতেই উনি মনে শান্তি পাচ্ছে না।

অবশ্য এ ব্যাপার নিয়ে জাকিরের এতটুকু মাথাব্যথা নেই। সে ভাইপো ভাইজীদের নিয়ে সুখী।

খলিল আলাদা হয়ে যাওয়ার পর জাকিরকে ব্যবসা করতে দেখে প্রথমে ভেবেছিল, এই জন্যে বোধ হয় সেই সময় সে কোনো প্রতিবাদ করেনি। আরও ভেবেছিল, নেসার ফকির নিশ্চয় জামাইকে ব্যবসা করার জন্য টাকা দিয়েছে। নচেৎ জাকির টাকা পেল কোথায়? কিন্তু পরে তাদের প্রতি জাকিরের ও তার বৌয়ের ব্যবহার দেখে শুনে ভীষণ অনুতপ্ত। তাই থাকতে না পেরে একদিন স্ত্রীকে বলল, তোমার কারণেই মায়ের পেটের ভাইকে আলাদা করে দিলাম।

নিহারবানু সবকিছু দেখেশুনে তাদের প্রতি খুশি হলেও হিংসা ত্যাগ করতে পারেনি। স্বামীর কথা শুনে বলল, তুমি যতই বল, জাকির ভাইয়ের বৌ কিন্তু পরী। ওর দ্বারাই তার অত উন্নতি। শুনেছি পরীদের অনেক টাকা থাকে। পরীর টাকাতেই জাকির ভাই অত বড়লোক হয়েছে। তা ছাড়া ছোটবৌ যদি পরী না হত, তা হলে এত বছর হয়ে গেল ছেলেমেয়ে হচ্ছে না কেন?

খলিল হেসে উঠে বলল, এতদিনেও তোমার মাথা থেকে পরীর ভূত গেল না? ছোট বৌ পরী নয়। আমি মৌলবী সাহেবকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। উনি বললেন, পরীর সঙ্গে মানুষের বিয়ে হয় না।

নিহারবানু বলল, জাকির ভাইয়ের বৌ পরী হোক আর না হোক, তার পেটে ছেলেমেয়ে হয়নি, এটাই আমার শান্তি।

কেন?

কেন আবার? তাদের ছেলেমেয়ে হলে, জাকির তাই কি আর আমাদেরকে এত সাহায্য করত? না আমাদের ছেলেমেয়েদের মানুষ করত? তা ছাড়া ওদের ছেলেমেয়ে না হলে সবকিছু আমাদের হয়ে যাবে।

খলিল খুব রেগে গিয়ে বলল, পাগলের মতো কি যাতা বলছ? দো'য়া করি, আল্লাহ যেন তাড়াতাড়ি ওদের ঘরের সন্তান দেয়।

নিহারবানু মুখ গোমড়া করে বলল, তুমি দো'য়া কর আর যাই কর, দেখে নিও, ওদের ছেলে পুলে হবে না। এই কথা বলে মুখ ঝামটা দিয়ে সেখানে থেকে চলে গেল।

দিলারা খানম একদিন জাকিরকে বললেন, এত বছর হয়ে গেল তোদের ছেলেমেয়ে হচ্ছে না কেন?

জাকির লজ্জা পেয়েও হেসে ফেলে বলল, আম্মা তুমি কি বলতো? ছেলেমেয়ে হওয়া আল্লাহ পাকের হাতে। কেন হচ্ছে না, তা তিনিই জানেন। তা ছাড়া সময় কি পালিয়ে যাচ্ছে নাকি? আল্লাহ ইচ্ছা করলে বুড়ো বয়সেও দিতে পারেন।

ছেলের কথা শুনে দিলারা খানমও হেসে ফেললেন। বললেন, পাগল ছেলের কথা শোন। আমিও তো সে কথা জানি। তবু একটু ডাক্তারপত্র বা তদ্বির-টদ্বির করা উচিত।

জাকির বলল, সে কথা তোমার বৌকে বলেছিলাম। বলল, "ডাক্তারপত্র লাগবে না, আব্বার সঙ্গে কথা বলে দেখতে পার।"

দিলারা খানম বললেন, বৌ তো ভালো কথাই বলেছে। তুই ওঁকে বলিসনি কেন?

জাকির বলল, ব্যবসার কাজে সময় করে উঠতে পারছি না। দেখি একদিন সময় করে যাব।

দিলারা খানম বললেন, হ্যাঁ তাই যা। ব্যবসা ব্যবসা করে এদিকে খেয়াল করবি না, এ কেমন কথা? আজ কালের মধ্যে তোর শ্বশুরের সঙ্গে দেখা কর।

জাকির বলল, ঠিক আছে, তাই করব।

জাকির মাকে বলল বটে, কিন্তু যাব যাব করেও এক সপ্তাহ কেটে গেল। এর মধ্যে একদিন নেসার ফকির মেয়ের বাড়ি এলেন। আপ্যায়নের পর পর্দার আড়াল থেকে দিলারা খানম ওঁকে বললেন, বিয়াই সাহেব, একটা ব্যাপারে জাকিরকে আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য তাগিদ দিচ্ছিলাম। ওতো ব্যবসা নিয়েই পাগল। সময়ই করে উঠতে পারেনি। আপনি যে ওকে ব্যবসার কি লাইন দেখালেন, সংসারের কোনো দিকে যদি খেয়াল করে?

নেসার ফকির মৃদু হেসে বললেন, আপনি যাই বলুন, জামাই বাবাজী কিন্তু ব্যবসা খুব ভালো বুঝে। তা আমার কাছে তাকে পাঠাতে চেয়েছিলেন কেন?

দিলারা খানম বললেন, এত বছর হয়ে গেল ওদের ঘরে কোনো আওলাদ হচ্ছে না, তাই কিছু তদ্বির করার জন্য আপনার কাছে যেতে বলেছিলাম। ডাক্তারপত্র করার জন্য জাকিরকে বলেছিলাম; কিন্তু বৌমা তাতে রাজি নয়।

নেসার ফকিরের ঠোঁটে মৃদু হাসি ফুটে উঠে মিলিয়ে গেল। কোনো কথা না বলে চুপ করে রইলেন।

দিলারা খানম কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বললেন, বিয়াই সাহেব কিছু বলছেন না যে?

নেসার ফকির একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আপনার গর্ভেও অনেক দেরিতে সন্তান এসেছে। এত তাড়াহুড়ো করছেন কেন?

দিলারা খানম শুনে চমকে উঠে অবাক হয়ে বললেন, কিছু মনে করবেন না বিয়াই সাহেব, আপনি সেকথা জানলেন কেমন করে?

নেসার ফকির বললেন, মাফ করবেন, সে কথা জানাতে আমি অক্ষম। তবে আমার মনে হয় দু'এক বছরের মধ্যে নাতি বা নাতনির মুখ আল্লাহপাক আপনাকে দেখাবেন। আপনার চিন্তা করার কোনো কারণ নেই। সবকিছু আল্লাহপাকের মর্জি। আপনি সাদিয়াকে এক গ্লাস পানি নিয়ে আসতে বলুন।

দিলারা খানম সাদিয়াকে ডেকে একগ্লাস পানি নিয়ে তার আব্বার কাছে যেতে বললেন।

সাদিয়া পানি নিয়ে এলে নেসার ফকির তার হাত থেকে গ্লাসটা নিয়ে দম করে মেয়ের হাতে ফেরৎ দেয়ার সময় বললেন, রাতে ঘুমোবার সময় তুমি ও জাকির খাবে। তারপর ঝোলা থেকে একটা সেবফল বের করে তার হাতে দিয়ে বললেন, পানি খাবার পর এটাও দু'জনে খাবে।

সাদিয়া পানির গ্লাস ও সেবফল রাখার জন্য ঘরে চলে গেল। নেসার ফকির বিয়ানকে উদ্দেশ্য করে বললেন, জাকির ঘরে আসে কখন?

এশার নামাযের পর আসে।

দুপুরে আসে না?

সব দিন আসে না। যেদিন আসে না, সেদিন একজন কর্মচারী এসে ভাত নিয়ে যায়।

আমি আজই চলে যাব। তার সঙ্গে দেখা করা দরকার।

আপনি মেয়ে জামাইয়ের বাড়িতে কখনও থাকেন না। আসেনও খুব কম। আজ আপনাকে থাকতে হবে।

আমি ফকির মানুষ। কোথাও থাকতে পারি না। তা ছাড়া আপনি তো জানেন, আপনার বিয়ান ঘরে একা। জাকিরকে বরং আমার কথা বলে কাউকে দিয়ে খবর পাঠান।

সাদিয়া ফিরে এসে শ্বাশুড়ীর কাছে ছিল। আব্বা থেমে যেতে শাশুড়ীকে বলল, আমার জ্ঞান হওয়া থেকে আব্বাকে কোথাও রাত কাটাতে দেখিনি। আপনি আপনার ছেলেকে ডেকে আনার ব্যবস্থা করুন।

দিলারা খানম বললেন, ঠিক আছে, তাই করছি।

শাশুড়ী সেখান থেকে চলে যাওয়ার পর সাদিয়া আব্বাকে নিয়ে নিজের ঘরে এনে বসাল।

জাকির শ্বশুরের খবর পেয়ে ঘন্টাখানের মধ্যে ঘরে এসে প্রথমে সালাম দিল তারপর বেখেয়ালে মাথা নিচু করে কদমবুসি করতে গেল।

নেসার ফকির সালামের উত্তর দিয়ে তাড়াতাড়ি তার হাত ধরে দাঁড় করিয়ে বললেন, কদমবুসি করার তরীকা যদি রাখতে না পার, তা হলে না করাই ভালো। কারণ মাথা নিচু করে কদমবুসি করা গোনাহে কবিরা। মাথা শুধু আল্লাহ পাকের কাছে নিচু হবে, অন্য কারো কাছে নয়। তারপর এক হাতে মেয়েকে ও অন্য হাতে জামাইকে ধরে বললেন, আল্লাহপাক তোমাদের উপর রহমত বর্ষণ করুক। তোমাদের মনের নেক বাসনা পূরণ করুক। খবরদার আল্লাহপাকের সঙ্গে কোনো দিন শরীক করবে না। তাঁর ও তাঁর রসুল (দঃ) এর হুকুম সর্বক্ষেত্রে মেনে চলবে। আর মায়ের সঙ্গে মধুর ব্যবহার করবে। কখনও কটু কথা বলবে না। তারপর তাদের দু'জনের মাথায় চুমো খেয়ে ছেড়ে দিয়ে জাকিরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, দুনিয়াদারী করতে গিয়ে আল্লাহ ও তাঁর রসুল (দঃ) এর পথ থেকে এতটুকুও সরে যাবে না। দুনিয়াদারীর উচ্চ আশা মানুষকে জাহান্নামের পথে নিয়ে যায়। আর তাতে ইন্ধন যোগায় শয়তান। আল্লাহপাক কুরআনের বহু জায়গায় বলেছেন, "তোমরা শয়তানের পদাঙ্গ অনুস্মরণ করো না, কারণ শয়তান তোমদের প্রকাশ শত্রু।"

জাকির বলল, ইনশা আল্লাহ আমরা আপনার কথা মেনে চলার চেষ্টা করব।

সেদিন নেসার ফকির দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর সকলের কাছে থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

রাতে ঘুমাবার সময় সাদিয়া আব্বার দম করে দেয়া পানির গ্লাস স্বামীর হাতে দিয়ে বলল, অর্ধেক খেয়ে আমাকে দিবেন, আমি খাব।

জাকির মৃদু হেসে বলল, ছেলেমেয়ে হওয়ার জন্য আব্বা নিশ্চয় দম করে দিয়েছেন?

সাদিয়াও মৃদু হেসে বলল, জি আপনি ঠিক বলেছেন।

জাকির অর্ধেকটা খেয়ে গ্লাসটা সাদিয়ার হাতে দেয়ার সময় বলল, কোনো তাবিজ টাবিজ দিয়ে গেছেন নাকি?

সাদিয়া আবার মৃদু হেসে বলল, জি না। তবে এটাও দু'জনকে খেতে বলেছেন বলে সেবটা তার হাতে দিল। তারপর গ্লাসের পানিটা খেয়ে গ্লাসটা তাকে রেখে এল।

জাকির তাকে কোলে বসিয়ে জড়িয়ে ধরে বলল, এটাকে আর অর্ধেক না করে এক সঙ্গে খাই এস। তারপর নিজে এক কামড় খেয়ে সাদিয়ার মুখের কাছে ধরে বলল, নাও তুমিও খাও।

এই ঘটনার প্রায় একবছর পর সাদিয়ার কোল আলো করে এক পুত্র সন্তান জন্ম নিল। যে রাতে সন্তান জন্মাল, সেদিন সন্ধ্যের পর থেকে সাদিয়া প্রসব ব্যথা হচ্ছে বুঝতে পেরেও শাশুড়ীকে কিছু বলল না। খাওয়া দাওয়ার পর স্বামীকে বলল, আপনি আজ পাশের রুমে থাকবেন। আর এই কথা কখনো কাউকে বলবেন না। এমন কি আম্মাকেও না।

জাকির বলল, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, তোমার শরীর খারাপ। যদি বাচ্চা টাচ্চা হয় তখন কি হবে? আম্মাকে জানাতে হবে না।

সাদিয়া বলল, জি না, জানাবেন না। তারপর তার দুটো হাত ধরে চোখের পানি ফেলতে ফেলতে বলল, আপনার কথার অবাধ্য কখনো হইনি। আর আপনার কাছে কোনো অনুরোধও করিনি। আজ আমার এই অনুরোধটুকু রাখতেই হবে।

জাকির তার চোখের পানি মুছে দিয়ে বলল, ঠিক আছে, তাই হবে। কিন্তু তোমার কোনো অসুবিধে...।

সাদিয়া তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, কোনো অসুবিধে হলে তখন আপনাকে ডাকব। তবে আমি না ডাকা পর্যন্ত আমার কাছে আসবেন না।

জাকির স্ত্রীকে আদর করে পাশের রুমে ঘুমাতে গেল। ঐরুমে যাওয়ার জন্য ভিতর থেকেও দরজা আছে।

সাদিয়া স্বামীর সঙ্গে এসে বিছানা ঠিক করে দিল। তারপর তাকে ঘুমাতে বলে নিজের রুমে ফিরে এসে দরজা বন্ধ করে খুব আস্তে ছিটকিনি লাগিয়ে দিল।

জাকির সাদিয়ার চিন্তায় জেগে থাকার চেষ্টা করল। কিন্তু আজ যেন তার দু'চোখ রাজ্যের ঘুম এসে চেপে ধরল। কিছুক্ষণের মধ্যে সে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। একবারে ভোরে মোয়াজ্জেনের আযান শুনে তার ঘুম ভাঙ্গল। বিছানা ছেড়ে উঠে দরজায় কান লাগিয়ে পাশের রুমে কোনো সাড়া শব্দ না পেয়ে ভাবল, তা হলে রাতে সাদিয়ার কোনো অসুবিধে হয়নি। তারপর সে মসজিদে নামায পড়তে চলে গেল।

নামায পড়ে ফিরে এসে বাইরের দিকে দরজা আল্গা দেখে ঠেলে ভিতরে ঢুকে যে দৃশ্য দেখল, তাতে সে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে এক দৃষ্টে সেদিকে তাকিয়ে রইল। সাদিয়া একটা চাঁদের মতো ফুটফুটে বাচ্চা কোলে নিয়ে খাটের উপর বসে আছে।

স্বামীকে ঐভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে সাদিয়া মৃদু হেসে বলল, আল্লাহপাকের রহমতে কোনো অসুবিধে হয়নি। তাই আপনাকে বিরক্ত করিনি। জানেন, আমাদের পুত্র সন্তান হয়েছে।

সাদিয়ার কথা জাকিরের কানে গেল না। সে তখন ভাবির ছেলেমেয়ে হওয়ার সময় যে সব ঘটনা ঘটে, সেসব ভাবছিল। প্রসবের সময় পাড়ার ধাইমাকে ডাকা হয়। কত বয়স্কা মেয়েরা এসে ভীড় করে। বড় মেয়ে তাহমীনা হওয়ার সময়, ভাবি দু'তিনদিন প্রসব ব্যথায় কষ্ট পেয়েছিল। তাদের তখন আর্থিক অবস্থা খারাপ ছিল। টাকার জন্য বড় ডাক্তার আনতে পারেনি। শেষে ভাবির কান্নাকাটি দেখে আম্মার কথায় ভাইয়া টাকা ধার করে হাসপাতাল থেকে একজন বড় ডাক্তার এনেছিল। তিনি একজন নার্সসহ একদিন থেকে প্রসব করিয়ে গেছেন। আর সাদিয়া প্রথম বাচ্চা প্রসব করল অথচ বাড়ির কেউ জানতে পারল না? তাছাড়া প্রসবের পর পোয়াতীর যে ....অবস্থা হয়, সাদিয়ার মধ্যে সে সবের কণামাত্র দেখতে পেল না। জাকিরের কাছে ব্যাপারটা অলৌকিক বলে মনে হতে লাগল।

স্বামীর অবস্থা বুঝতে পেরে সাদিয়া বলল, আপনি কি অত ভাবছেন? পুত্র সন্তান হয়েছে, খুশি হন নি?

স্ত্রীর কথায় জাকিরের হুঁশ হল। শোকর আলহামদুলিল্লাহ বলে বলল, আমি যে কত খুশি হয়েছি, তা আমার মাবুদ জানেন? কিন্তু বলে....থেমে গেল।

সাদিয়া বলল, আমি আপনার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি। এটা নিয়ে বেশি চিন্তা করবেন না। এক সময় সব কথা বলব। এখন আম্মাকে সুসংবাদটা দিয়ে ডেকে নিয়ে আসুন।

জাকিরের জ্ঞান হওয়ার পর থেকে বুবুদের বাড়িতে গিয়ে শুনেছিল, নেসার ফকিরের বৌ পরী। তখন কিশোর জাকিরের মনে খুব কৌতুহল জাগে। তারপর যখন শুনল, তার মেয়ে মক্তবে পড়তে আসে তখন তাকে দেখার জন্য আরও বেশি কৌতুহল অনুভব করে এবং বুবুকে জিজ্ঞেস করে একদিন কবরস্থানের রাস্তার পাশে তাকে দেখে। দেখে তাকে সত্যি পরী বলে মনে করে। সেই থেকে সাদিয়ার মুখের ছবি এক সেকেণ্ডের জন্যও ভুলতে পারেনি। তাই প্রতিমাসে আট দশ মাইল হেঁটে এসে বুবুদের বাড়িতে একদিন থাকত এবং সাদিয়ার সঙ্গে একই জায়গায় দেখা করত। পরে সাদিয়া যখন স্কুলে পড়ে তখন দু'জনের মধ্যে আলাপ হতে থাকে এবং দু'জন দু'জনকে ভালবেসে ফেলে। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেয়ার পর একদিন সাদিয়াকে বলল, তোমাকে আমি বিয়ে করতে চাই। সাদিয়া তখন বলল, আমিও তাই চাই। কিন্তু আমার আব্বা আম্মা রাজি হবেন না শুনে জাকির বলল, তোমাকে পাওয়ার জন্য আমি আমার জীবন পর্যন্ত বাজি রাখব। সাদিয়া বলল, আমিও। তারপর সাদিয়া যখন স্কুল বন্ধ করে দিল এবং তার সঙ্গে দেখা করতে পারল না তখন জাকির নেসার ফকিরের সঙ্গে দেখা করে তাদের ঘরে গিয়ে যা দেখেছিল, খেয়েছিল এবং নেসার ফকির যে সব বলেছিলেন, তাতে সাদিয়াকে ও তার মাকে পরী বলে ধারণা হয়েছিল। তবু সে ভয় পাইনি। বরং সাদিয়াকে বিয়ে করার দৃঢ় সংকল্প করে সে কথা নেসার ফকিরকে বলেছিল। বিয়ের পর সাদিয়ার কথাবার্তায়, আচার ব্যবহারে এবং তার শরীর তুলোর মতো নরম জানতে পেরে দৃঢ় ধারণা জন্মায়, সে পরী। কিন্তু সেকথা সে কাউকে ঘুণাক্ষরেও বলেনি। বরং যখন সমবয়সী বন্ধুরা সাদিয়া পরী কিনা জিজ্ঞেস করেছে তখন হেসে উঠে উড়িয়ে দিয়ে বলেছে, দূর বোকা, পরীর সঙ্গে কি কখনও মানুষের বিয়ে হয়? আসলে সেও সাদিয়ার মধ্যে অল্প কিছু ছাড়া অস্বাভাবিক তেমন কিছু না দেখে সে যে পরী হতে পারে, এতদিন সে কথা ভুলেই গিয়েছিল। এখন প্রসবের ব্যাপার নিয়ে জাকিরের পুরান দিনের কথাগুলো মনে পড়ল।

সাদিয়া জিজ্ঞেস করল, এতক্ষণ ধরে কি ভাবছেন? আম্মাকে খবরটা দেবেন না?

জাকির তার কথার উত্তর না দিয়ে খাটের কাছে এসে সুবহান আল্লাহ বলে বাচ্চাকে চুমো খেল। তারপর বেরিয়ে গিয়ে মাকে খবরটা জানাল।

দিলারা খামন নামায পড়ে অজিফা পড়ছিলেন। শুনে আল্লাহ পাকের শোকর গুজারী করে তাড়াতাড়ি বৌমার ঘরে ঢুকে তিনিও খুব অবাক হলেন। তারপর কাছে এসে বললেন, ছোট বৌ, সে সময় আমাকে খবর দেয়া তোমার উচিত ছিল। তারপর বাচ্চাকে কোলে নিয়ে আদর করতে করতে জাকিরকে বললেন, আযান দে।

জাকির আযান ও আক্বামত দেয়ার পর আম্মাকে সাদিয়ার বাচ্চা হওয়ার ব্যাপারে কোনো কথা জিজ্ঞেস করতে না শুনে চিন্তা করল, আম্মা কি তা হলে সাদিয়ার আসল পরিচয় জানে?

দিলারা খানম ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাবছিস? যা মিষ্টি কিনে নিয়ে আয়।

জাকির মিষ্টি কিনতে চলে গেল।

নিহারবানু জানত না, সাদিয়া পোয়াতী। কারণ আলাদা হয়ে যাওয়ার পর যে যার সংসার নিয়ে থাকে। সাদিয়াকে দেখতে পারে না বলে তার কাছে আসেনি। তা ছাড়া সাদিয়া সব সময় এমন ঢিলে কাপড় পরত তাতে করে সে যে পোয়াতী, তা বাইরের কেউ জানতে পারে নি। তাই দিলারা খানম যখন বড় বৌদের মিষ্টি দিতে গিয়ে খবরটা জানালেন তখন সে খুব অবাক হল। বলল, আম্মা, ছোটবৌ যে পোয়াতী ছিল, কই আমরা তো কিছুই শুনি নাই। যাকগে, খোকা হয়েছে শুনে খুশি হলাম। আমি তো মনে করেছিলাম ছোট বৌ বাঁজা।

দিলারা খানম কিছু না বলে ফিরে এলেন। শাশুড়ীর সামনে নিহারবানু মুখে ঐ কথা বললেও মনে মনে হিংসায় ফেটে পড়ছিল। উনি চলে যাওয়ার পর চিন্তা করল, আমার আশায় বাজ পড়ল। ভেবেছিলাম, পরীটার ছেলেপুলে না হলে ব্যবসা-পাতি , বাড়ি-ঘর, জমি-জায়গা সব কিছু আমাদের হয়ে যাবে। সে আশা আর পূরণ হল না। ছেলেটা মরে গেলেই ভালো।

খলিল ঘরে এলে নিহারবানু বাটিতে গোটা চারেক মিষ্টি তাকে খেতে দিয়ে বলল, তোমার ভাইপো হয়েছে, মিষ্টি মুখ কর।

খলিল আলহামদুল্লিাহ বলে বলল, আল্লাহ, তুমি ছেলেটার হায়াৎ দারাজ করো। তাকে নেকবক্ত করো। তারপর একটা মিষ্টি মুখে দিয়ে বলল, ছেলেমেয়েরা সব খেয়েছে?

নিহারবানু মুখ ঝামটা দিয়ে বলল, হ্যাঁ খেয়েছে। তারপর আবার বলল, তুমি তো ভাইপোর জন্যে খুব দো'য়া করলে, সে বেঁচে থাকলে আমাদের আশা পূরণ হবে? সব সম্পত্তির মালিক তো সেই হবে?

খলিল স্ত্রীর ইঙ্গিত বুঝতে পেরে রেগে উঠে বলল, তোমার স্বভাব কি কোনোদিন পরিবর্তন হবে না? জেনে রেখ, ধন-সম্পত্তি আল্লাহ পাকের হাতে। যাকে ইচ্ছা দেন, আবার কেড়েও নেন। তিনি জাকিরকে অনেক দিয়েছেন। আর জাকিরও আমাদেরকে কত দিচ্ছে। তবু ওরকম কথা বলতে পারলে? বেশি লোভ ভালো নয় বুঝলে? এ কথা কি শোন নি? "লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।" সাবধান করে দিচ্ছি, জাকিরের ছেলের কোনো দিন অনিষ্ট চিন্তা করবে না। যারা অন্যের ক্ষতি করে, তারা প্রকৃতপক্ষে নিজেরই ক্ষতি করে।

নিহারবানু বিরক্ত কণ্ঠে বলল, আমি কি তোমার ভাইপোর ক্ষতি করার কথা বললাম? তারপর অন্যত্র চলে গেল।

জাকির সমেশপুরে লোক পাঠিয়ে বড় বোনের বাড়িতে ও শ্বশুর বাড়িতে মিষ্টিসহ খবর পাঠাল।

নেসার ফকির সাতদিনে এসে জাকিরকে দু'টো খাসি জবেহ্ করে নাতির আকিকা করার কথা বললেন।

জাকির সেই দিনেই আকিকার ব্যবস্থা করল। নেসার ফকির নাতির নাম রাখলেন, আরিফুল্লাহ। দিলারা খানম নাম দিলেন আরিফ।

আরিফ দু'বছরের হতে সাদিয়া বুকের দুধ ছাড়িয়ে দিল। একদিন সে স্বামীকে বলল, কয়েকদিন আব্বা আম্মার কাছ থেকে বেড়িয়ে আসি চলুন।

জাকির বলল, ঠিক আছে যাওয়া যাবে। তারপর একদিন মায়ের হুকুম নিয়ে স্ত্রী ও ছেলেসহ শ্বশুরবাড়ি গেল। তিন চারদিন থেকে তাদেরকে সেখানে রেখে বুবুর সঙ্গে দেখা করে বাড়ি ফিরে এল।

কয়েকদিন পর জাকির সাদিয়াকে নিয়ে আসার জন্য সমেশপুর গেল।

ঐদিন রাতে সাদিয়া স্বামীর বুকে মাথা রেখে বলল, প্রিয়তম, আল্লাহপাক যদি প্রথমে আমাকে দুনিয়া থেকে তুলে নেন, তা হলে আপনি খুব দুঃখ পাবেন তাই না?

জাকির স্ত্রীকে আদর দিতে দিতে বলল, সে কথা জেনে জিজ্ঞেস করছ কেন? আল্লাহপাকের ইচ্ছা যদি তাই হয়, তা হলে আমিও বেশি দিন বাঁচব না। তারপর চোখে চোখ রেখে বলল, আজ হঠাৎ এ রকম কথা বললে কনে?

সাদিয়া বলল, তা বলতে পারব না। হঠাৎ কথাটা মনে হল, তাই বললাম।

জাকির বলল, আল্লাহপাকের যা মর্জি তাই হবে। তুমি আর ওরকম কথা মুখে আনবে না। শুনে আমার বুক টিপ টিপ করছে।

সাদিয়া স্বামীকে জড়িয়ে ধরে বলল, ঠিক আছে, আর বলব না। তারপর তারা সারারাত আনন্দ ফুর্তি করে কাটাল। রাত তিনটের সময় ফরয গোসল করে তারা তাহাজ্জুদের নামায পড়ে কুরআন তেলাওয়াত করল। তারপর ফজরের নামায পড়ে ঘুমাতে গেল। বিছানায় শোবার পর সাদিয়া বলল, আমার বুকে ব্যাথা করছে।

জাকির তাড়তাড়ি উঠে বসে তার বুকে হাত বুলোতে বুলোতে সুরা ইয়াসীন পড়ে ফুঁক দিতে লাগল।

সাদিয়া চোখের পানি ফেলতে ফেলতে বলল, প্রিয়তম, খুব সম্ভব আমি আর বাঁচব না। আপনি আব্বাকে ডাকুন।

জাকির রুমের বাইরে এসে শ্বশুরকে নামায পাটিতে তসবী পড়তে দেখে সালাম দিয়ে সাদিয়ার কথা জানাল।

নেসার ফকির সালামের উত্তর দিয়ে বললেন, তুমি যাও, আমি তোমার আম্মাকে নিয়ে আসছি।

জাকির ফিরে এলে সাদিয়া ছটফট করতে করতে বলল, আমি এ দুনিয়া থেকে চলে যাচ্ছি, আমাকে মাফ করে দিন।

জাকির তার মুখে মুখ ঠেকিয়ে অশ্রুভেজা চোখে বলল, তুমি চলে গেলে আমি বাঁচব কি করে? এমন কথা বলতে নিষেধ করলাম না?

সাদিয়া বলল, আপনি এত ভেঙ্গে পড়ছেন কেন? কুরআনপাকে পড়েছেন না, প্রত্যেক মানুষকে মরণের পেয়ালা চিখতে হবে।" তবে দু'দিন আগে আর পরে, আপনি সবুর করুন। আমার আরিফের যেন কোনো রকম অযত্ন না হয়, সেদিকে খুব লক্ষ্য রাখবেন।

এমন সময় নেসার ফরিক স্ত্রীকে নিয়ে সেখানে এসে জাকিরকে বললেন, তুমি বাইরে অপেক্ষা কর। না ডাকা পর্যন্ত এস না।

জাকিরের স্ত্রীর কাছ থেকে যেতে ইচ্ছা করল না। তবু শ্বশুরের কথায় বেরিয়ে এসে বারান্দায় অপেক্ষা করতে লাগল। তখন তার চোখ থেকে পানি পড়ছিল আর শ্বশুরের প্রতি খুব রাগ হচ্ছিল।

কিছুক্ষণ পর নেসার ফকির বেরিয়ে এসে জাকিরের কাঁধে একটা হাত রেখে বললেন, কাঁদছ কেন? সবুর কর। সাদিয়া আর নেই।

জাকির না.....বলে চিৎকার করে ঘরের ভিতর যাওয়ার সময় ধড়াস করে মাটিতে পড়ে জ্ঞান হারাল।

নেসার ফকির পানি এনে চোখে মুখে ছিটিয়ে জ্ঞান ফেরাবার চেষ্টা করলেন; কিন্তু জাকিরের জ্ঞান ফিরল না। যখন ফিরল তখন বিকেল পাঁচটা।

নেসার ফকির তাকে অনেক উপদেশ দিয়ে প্রবোধ দিলেন। তারপর বললেন, তোমার জোহরের নামায কাযা হয়ে গেছে। প্রথমে জোহরের কাযা পড়ে আসর পড়ে নাও। রাতে সাদিয়ার দাফন হবে। তারপর এক গ্লাস সরবত তার হাতে দিয়ে বললেন, এটা খেয়ে ফেল, সকাল থেকে তুমি কিছু খাওনি।

জাকিরের এতক্ষণ ক্ষিধের কথা মনেই ছিল না। শ্বশুরের মুখে খাওয়ার কথা শুনে প্রচণ্ড ক্ষিধে অনুভব করল। কিছু না বলে সরবত খেয়ে ফেলল। তারপর নামায পড়ার জন্য অজু করতে গেল।

সরবতের এ্যাকসনে হোক অথবা অন্য যে কোনো কারণে হোক, জ্ঞান ফেরার পর থেকে জাকির নরম্যাল হতে পারল না। কোনো কথা ও বলতে পারল না। শতচেষ্টা করেও শ্বশুরকে কিছু বলতে পারল না। তার মনে হল, কেউ যেন গলা চেপে রেখেছে। নিজেদের ও বুবুদের বাড়িতে যে একটা খবর দিতে হবে, সে কথা খেয়ালও হল না। সব কিছু এলোমেলো মনে হতে লাগল। একটা ঘোরের মধ্যে সময় চলে যেতে লাগল। অযু করে সেই যে আসরের নামায পড়েছে, সেই অজুতে এশার নামায পড়ে নামায পাটিতেই ঘুমিয়ে পড়ল। যখন তার ঘুম ভাঙ্গল তখন দেখল, চারদিকে যেন আলোর বন্যা বয়ে যাচ্ছে। আর লম্বা চওড়া অনেক লোকজন আনাগোনা করছে। কিন্তু কেউ কোনো কথা বলছে না। প্রথমে জাকির মনে করেছিল এরা সমেশপুরেরই লোকজন। পরে তাদের দিকে ভালো করে লক্ষ্য করে বুঝতে পারল, তা নয়। ছোটবেলা থেকে এই গ্রামে যাতায়াত করেছে। অনেককেই চিনে; কিন্তু এদের কাউকেই চিনতে পারল না।

তাদের মধ্যে অনেকে এসে তাকে সালাম জানাচ্ছে। জাকির সালামের উত্তর দিচ্ছে ঠিক, কিন্তু নিজের গলার শব্দ নিজে শুনতে পাচ্ছে না।

রাত দু'টোর সময় নেসার ফকির জাকিরের কাছে এসে বললেন, চল জানাজা হবে।

জাকির যন্ত্রচালিতের মতো শ্বশুরকে অনুস্বরণ করল। তখন তার মনে শেষবারের মত সাদিয়াকে দেখার জন্য ভীষণ ছটফট করতে লাগল। কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলতে পারল না। সুবেহ সাদেকের একটু আগে দাফনের কাজ শেষ হল। তারপর গ্রামের মসজিদ থেকে ফযরের আযান ভেসে আসার সাথে সাথে চারদিকের আলো নিভে গেল। সব লোকজনও যেন মুহূর্তে গায়েব হয়ে গেল। জাকিরের কাছে সবকিছু ভেল্কী বলে মনে হল। ফজরের নামাযের পর তার দু'চোখে ঘুম নেমে এল। সে আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

নেসার ফকিরের ডাকে যখন তার ঘুম ভাঙ্গল তখন বেলা এগারটা। তাকে চোখ মেলে চাইতে দেখে নেসার ফকির বললেন, উঠে গোসল কর, খাওয়া দাওয়া করবে।

এবারে ঘুম থেকে জাগার পর জাকিরের কাছে সবকিছু নরম্যাল মনে হল। শ্বশুরের কথায় তাড়াতাড়ি উঠে বসল। তখন তার গত দিন ও রাতের সব ঘটনা একের এক মনে পড়তে লাগল। তার মনে হল, সে যেন এতক্ষণ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিল। কিন্তু সাদিয়ার মৃত্যু সত্যি বলে মনে হতে শ্বশুরকে কিছু জিজ্ঞেস করতে গিয়ে ওঁর দিকে তাকিয়ে দেখল, উনি চলে গেছেন।

খাওয়া দাওয়ার পর নেসার ফকির জাকিরকে বললেন, বাবা জাকির, তোমাকে কয়েকটা কথা বলছি মন দিয়ে শোন; সাদিয়ার কথা তুমি ভুলতে পারবে না, সে কথা ঠিক। কিন্তু সে জন্যে ভেঙ্গে পড়ো না। যখন মনে পড়বে তখন "ইন্নাল্লাহা মায়াসসাবেরীন" পড়বে। আর তার জন্য দো'য়া করবে। তোমার বড়বোন ও বোনাইয়ের সঙ্গে আগের মতো যোগাযোগ রাখবে। সব সময় দীলে দীলে আল্লাহ'র জিকির করবে। তারপর তার কানে কানে এমন কিছু কথা বললেন, যা শুনে জাকির ডুকরে কেঁদে উঠে বলল; তা হলে আমি সবর করব কি করে?

নেসার ফকির বললেন, সবর কর বাবা সবর কর। দুনিয়া বড় মায়ার জায়গা। একে যত ভালবাসবে তত দুঃখ দেবে। এইজন্যে আল্লাহপাকের খাস বান্দা বান্দিরা দুনিয়াদারী করলেও দুনিয়াকে ভালো না বেসে ঘৃণা করেন। তারপর আরও অনেক সৎ উপদেশ দিয়ে তার বড়বোন ও দুলাভাইয়ের সঙ্গে দেখা করে বাড়ি ফিরে যেতে বললেন।

জাকির বলল, যাওয়ার আগে আমি সাদিয়ার কবর জিয়ারত করব।

নেসার ফকির বললেন, বেশ তো যাও, করে এস।

সাদিয়াকে ঘরের উত্তর পাশে কবর দেয়া হয়েছে। জাকির সেখানে গিয়ে আরও অবাক হল। করবটা পাকা। আর তার চারপাশে চারফুট উঁচু পাকা দেওয়াল। এত তাড়াতাড়ি কি করে এটা সম্ভব, তা ভেবে পেল না। তার মনে হল, সাদিয়াকে দেখার

পর থেকে আজ পর্যন্ত যা যটল তা সব অলৌকিক। কবর জিয়ারত করে ফিরে এসে চোখের পানি ফেলতে ফেলতে শ্বশুরকে কদমবুসি করে শাশুড়ীকে করতে গেলে তিনি বললেন, থাক বাবা আমাকে কদমবুসি করতে হবে না। দো'য়া করি, আল্লাহপাক তোমাকে সবর করার তওফিক দিন। তারপর আরিফকে আদর করে কোল থেকে নামিয়ে বললেন, এর দিকে খুব লক্ষ্য রেখ।

আরিফ আম্মুর কাছে যাব বলে কাঁদতে লাগল।

জাকির তাকে তুলে নিয়ে বুকে চেপে ধরে আদর করতে করতে শ্বশুর শাশুড়ীকে সালাম জানিয়ে দ্রুত চলে আসতে লাগল। তখন তার চোখ থেকে অবিরাম পানি পড়ছে।

বুবুদের বাড়িতে এসে জাকির তার কোলে আরিফকে দিয়ে বলল, বুবুগো, একে রেখে সাদিয়া দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে। কথা শেষ করে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল।

সুফিয়া চমকে উঠে "ইন্নালিল্লাহে.....রাজেউন" পড়ে বলল, কবে কি হল আমরা কিছুই জানতে পারলাম না? তারপর চোখের পানি ফেলতে ফেলতে আরিফকে আদর করতে লাগল।

আরিফ আম্মার কাছে যাব বলে কাঁদতে লাগল।

গোফরান বাইরে ছিল। ঘরে এসে তাদের অবস্থা দেখে স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলল, কি হয়েছে? তোমরা কাঁদছ কেন?

সুফিয়া বলল, সাদিয়া ভাবি মারা গেছে।

গোফরান "ইন্নালিল্লাহে.....রাজেউন" পড়ে জিজ্ঞেস করল, কবে মারা গেল? কি হয়েছিল? কই আমরা তো কিছু জানলাম না? কয়েকদিন আগে তো জাকির তাকে তার বাবা মার কাছে রেখে গেল।

জাকির সামলে নিয়ে কিভাবে সাদিয়া মারা গেল, বলল।

গোফরান ও সুফিয়া শুনে খুব অবাক হল।

সুফিয়া বলল, তুই তা হলে সাদিয়া ভাবি মারা যাওয়ার পর একবারও তাকে দেখিসনি?

জাকির বলল না। তারপর সাদিয়া মারা যাওয়ার আগে থেকে চলে আসার আগ পর্যন্ত যা কিছু ঘটেছিল, সবকিছু বলে বলল, সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে স্বপ্ন বলে মনে হয়েছে।

গোফরান বলল, নেসার ফকিরের অনেক কিছু আমার কেমন অবাস্তব অবাস্তব মনে হয়। এতবছর তাকে দেখছি; কিন্তু তাকে চিন্তে পারলাম না। যাই হোক, কি আর করবে। দুনিয়াতে যা কিছু ঘটে, তা আল্লাহপাকের ইশারাতেই ঘটে। সবর কর ভাই সবর কর। এ ছাড়া আর তোমাকে কি বলতে পারি?

পরের দিন সকালে নাস্তা খেয়ে জাকির বুবুও দুলাভাইকে বলল, আমি আরিফকে নিয়ে বাড়ি যাব।

সুফিয়া বলল, আরিফকে আমার কাছে রেখে যা। আমি ওকে মানুষ করব। তুইতো ব্যবসা নিয়ে থাকবি। ওকে দেখাশোনা করবে কে?

জাকির বলল, পরে সে কথা চিন্তা করব। এখন ওকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না। আম্মা দেখাশোনা করবে।

সুফিয়া কিছু বলতে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে দিয়ে গোফরান জাকিরকে বলল, হ্যাঁ তুমি ওকে নিয়ে যাও। আম্মা ছোট ভাবির মৃত্যুর খবর পেয়ে খুব দুঃখ পাবেন। আরিফকে পেয়ে তবু একটা সান্তনা পাবেন।

সুফিয়া আর বাধা দিল না।

জাকির আরিফকে নিয়ে চলে গেল।

জাকির চলে যাওয়ার পর সুফিয়া রুমে এসে বিছানায় শুয়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

গোফরান স্ত্রীর কাছে এসে পাশে বসে তার পিঠে হাত রেখে বলল, কেঁদে আর কি করবে? আমি তোমার এমন হতভাগা স্বামী, আজ পর্যন্ত তোমাকে একটা সন্তান উপহার দিতে পারলাম না।

সুফিয়া স্বামীকে জড়িয়ে ধরে ভিজে গলায় বলল, তুমি হতভাগা হতে যাবে কেন? বরং আমিই হতভাগী। মেয়ে হয়েও একটা সন্তান পেটে ধরতে পারলাম না।

গোফরান নিজের অপরাগতার কথা বলতে গিয়েও বলল না। ভাবল, বললে সুফিয়ার কাছে অপরাধী হয়ে যাবে। তাই তাকে সান্তনা দিতে লাগল।

সুফিয়া বলল, আরিফকে পেলে তবু দুঃখটা ভুলতে পারতাম।

গোফরান বলল, এতদিন যখন সবর করেছ তখন আরও কিছু দিন কর। নেসার ফকিরের কথা মনে পড়ছে, তিনি বলেছিলেন, আমরা অনেক বয়সে একটা ছেলে পাব। আমার মন বলছে, আমরা হয়তো কিছুদিনের মধ্যে আরিফকে পাব।

সুফিয়া বলল, আমারও তাই মনে হচ্ছে। তুমি ওঁর সঙ্গে দেখা কর।

গোফরান বলল, তুমি ঠিক বলেছ। কালই ওঁর সঙ্গে দেখা করব। তাকে আর দেখা করতে যেতে হল না। ঐদিন রাতে এশার নামায পড়ে মসজিদ থেকে বেরিয়ে নেসার ফকিরের সঙ্গে দেখা।

সালাম বিনিময়ের পর নেসার ফকির তাকে সাথে করে মক্তবের কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন, আপনি জাকিরের মুখে নিশ্চয় সব কিছু শুনেছেন। এখন আপনাকে কয়েকটা কথা বলব। কথাগুলো কখনও কারো কাছে প্রকাশ করবেন না। শুধু আপনার স্ত্রীকে জানাবেন। তাকেও প্রকাশ করতে নিষেধ করে দেবেন। আল্লাহ রাজি থাকলে আমরা আজ রাতেই এখান থেকে চলে যাব। জাকির এসে জিজ্ঞেস করলে বলবেন, আপনি কিছু জানেন না। আরিফকে আপনারা নিজের ছেলের মতো মানুষ করবেন। পঁচিশ বছরের আগে সে যেন তার পরিচয় জানতে না পারে। তাকে এমনভাবে মানুষ করবেন, সে যেন আপনাকে ও আপনার স্ত্রীকে নিজের মা বাবা মনে করে। তারপর গোফরানের হাতে একটা মাদুলি দিয়ে বললেন, আরিফের বয়স যখন সাত বছরের হবে তখন এটা

রূপার চেনে লাগিয়ে গলায় ঝুলিয়ে দেবেন। তাকে বুঝিয়ে বলবেন, এটা যেন সারাজীবন না খুলে। পঁচিশ বছর আগে যদি সে কারো কাছ থেকে নিজের পরিচয় জানতে পারে এবং আপনাদেরকে সে বিষয়ে কিছু জিজ্ঞেস করে আপনারা তাকে জানাবেন না। পরের কথায় কান দিতে নিষেধ করবেন। পঁচিশ বছরের পর যদি জানার জন্য পিড়াপিড়ী করে তখন বলবেন, আগামী কাল সকালে জানাবেন। নেসার ফকির এবার একটা রূপার কবজ গোফরানের হাতে দিয়ে বললেন, ঐদিন গভীর রাতে আরিফ যখন ঘুমিয়ে থাকবে তখন ঐ মাদুলীর চেনের সঙ্গে এটাও বেঁধে দিবেন। কিন্তু খুব সাবধানে কাজটা করবেন। আরিফ যেন বুঝতে না পারে। তারপর সে তার পরিচয় জানলেও কোনো অসুবিধে হবে না।

গোফরান ভয়ার্তস্বরে বলল, যদি সে সময় আরিফ জেগে যায়?

নেসার ফকির বললেন, তা জেগে যেতে পারে। এক কাজ করবেন, খাওয়ার পর সরবত বা দুধের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে খেতে দিবেন, তা হলে জেগে যাওয়ার ভয় থাকবে না। আর একটা কথা, সাত বছরের মধ্যে হয়তো আরিফ এমন কিছু কথা বলতে পারে অথবা এমন কোনো কাজ করতে পারে, যা দেখে শুনে আপনারা শুধু অবাকই হবেন না, ভয় ও পেতে পারেন। তখন তাকে আপনারা ঐ রকম কথা বলতে বা ঐ রকম কাজ করতে বুঝিয়ে নিষেধ করবেন। মাদুলী পরার পর আর অস্বাভাবিক কিছু বলবে না বা করবে না।

গোফরান জিজ্ঞেস করল, আমরা আরিফকে কবে পাব।

নেসার ফকির বললেন, সে কথা আল্লাহপাক জানেন, আমি বলব কি করে?

গোফরান আবার জিজ্ঞেস করল, আপনি শুধু আরিফের কথা বললেন, জাকিরের কথা কিছু বলবেন না?

নেসার ফকির বললেন, তার কথাও কিছু বলতে পারব না। আল্লাহপাক আলেমুল গায়েব। তিনি ভূত ভবিষ্যৎ সব কিছু জানেন। তিনি ছাড়া অন্য কারো জানার ক্ষমতা নেই। জাকিরের কথা থাক। আপনাকে যা যা বললাম, ঘরে গিয়ে আপনার স্ত্রীকেও বলবেন। আর একটা কাগজে লিখে লুকিয়ে রাখবেন। যাতে করে অন্য কেউ অথবা আরিফ যেন কোনোরকমে না পায়। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, এবার আপনি ঘরে যান। ফিরতে দেরি হচ্ছে বলে আপনার স্ত্রী হয়তো চিন্তা করছেন। দো'য়া করি, "আল্লাহপাক আপনাদেরকে কামিয়াব করুন।" এই কথা বলে সালাম বিনিময় করে নেসার ফকির চলে গেলেন।

গোফরান ওঁর দিকে তাকিয়ে রইল। অন্ধকার রাত। তাই বেশিদূর দেখা গেল না। গোফরান ছেলেবেলা থেকে ভয় কাকে বলে জানে না। কিন্তু নেসার ফকির অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর তার গা ভয়ে ছম ছম করে উঠল। দো'য়া ইউনুস পড়তে পড়তে ঘরে ফিরে এল।

সুফিয়া নামায পড়ে স্বামীর জন্য অপেক্ষা করছিল। ভারাক্রান্ত মনে তাকে ফিরতে দেখে বলল, এত দেরি হল যে? রাত কত হয়েছে খেয়াল নেই বুঝি? কোনোদিন আমাকে না বলে এত রাত অবধি বাইরে থাক না। আমার যা দুশ্চিন্তা হচ্ছিল।

গোফরান খাটে বসে স্ত্রীকেও পাশে বসাল। তারপর বলল, আমার বয়স প্রায় পঞ্চাশের মত। এখনও আমার জন্য দুশ্চিন্তা করবে?

সুফিয়া বলল, করব না কেন? আব্বা আম্মা মারা যাওয়ার পর জ্ঞাতী শত্রুরা সম্পত্তির লোভে যে রকম উঠে পড়ে লেগেছে, তাতে করে আপনা থেকে দুশ্চিন্তা হয় কিনা তুমিই বল।

গোফরান বলল, আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় এবার জ্ঞাতী শত্রুদের মুখ বন্ধ হয়ে যাবে। আমাদের ঘরে কিছুদিনের মধ্যে ছেলে আসছে। শরীয়তের আইন অনুসারে তার নামে সবকিছু উইল করে দেব।

সুফিয়া স্বামীর কথা শুনে অবাক হয়ে তার মুখে দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।

গোফরান মৃদু হেসে স্ত্রীকে আদর দিয়ে বলল, বললেই বুঝতে পারবে। তারপর নেসার ফকিরের সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা আরিফের কথা এবং মাদুলী ও কবজ পরাবার কথা বলল।

সুফিয়া শুনতে শুনতে বাস্তব জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। কিছুক্ষণ পর বাস্তবে ফিরে এসে বলল, আমার কি মনে হচ্ছে জান, নেসার ফকির মানুষ হলেও খুব বোজর্গ লোক। আর ওঁর স্ত্রী সত্যি পরী। সাদিয়া ভাবিকে যতটুকু জেনেছি, সে মানুষের পয়দায়েশ হলেও পরীর পেটে হয়েছে, তাই সেও পরীর জাত।

গোফরান বলল, আমারও তাই মনে হয়। তা না হলে সাদিয়া ভাবি মারা গেল, গ্রামের কাউকে জানাল না। এমন কি আমাদেরকেও না। তা ছাড়া জাকির দাফন কাফনের সময় যা কিছু ঘটতে দেখেছে তা অলৌকিক। আর যাদেরকে দাফনে শরীক হতে দেখেছে, তারা নিশ্চয় জীন।

সুফিয়া বলল, তোমার কথা ঠিক। এখন ওসব কথা বলে আর কি হবে? রাত হয়েছে, খাবে চল।

গোফরান বলল, তার আগে কাগজ কলম দাও। নেসার ফকির যা যা বললেন, লিখে রাখি। নচেৎ ভুলে যাব।

সুফিয়া কাগজ কলম এনে দিল।

গোফরান লিখে কাগজ, মাদুলী ও কবজ স্ত্রীর হাতে দিয়ে বলল, এগুলো সিন্দুকের চোরা কুঠরীতে রেখে দাও। একসময় একটা রূপার চেন তৈরী করে ঐগুলোর সঙ্গে রাখতে হবে। এসব কথা ভুলেও কাউকে বলবে না। আর আরিফও যেন ঘুণাক্ষরে জানতে না পারে।

সুফিয়া বলল, তা আর তোমাকে বলে দিতে হবে না। তারপর সেগুলো সিন্দুকে রেখে এসে বলল, চল খাবে চল।

জাকির বাড়িতে এসে মায়ের কোলে আরিফকে দিয়ে বলল, তোমার বৌকে আল্লাহপাক দুনিয়া থেকে তুলে নিয়েছেন। কথা শেষ করে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

দিলারা খানম আঁতকে উঠে বললেন, কি বললি? বৌমা মারা গেছে?

জাকির চোখের পানি ফেলতে ফেলতে বলল, হ্যাঁ আম্মা, পরশুদিন ভোরে মারা গেছে।

দিলারা খানম "ইন্নাল্লিাহে.....রাজেউন" পড়ে আরিফকে বুকে জড়িয়ে বললেন, আল্লাহপাকের কি মহিমা, এতটুকু ছেলে মা হারা হয়ে গেল। তারপর ছেলেকে কাঁদতে দেখে বললেন, কেঁদে আর কি করবি বাবা? যে যায় সে কি আর ফিরে আসে?সবর কর বাবা, সবর কর। আল্লাহ বিপদে সবর করতে বলেছেন। অমন বৌ পাওয়া ভাগ্যের কথা। যতদিন তোর ভাগ্যে ছিল ততদিন তাকে নিয়ে ঘর করেছিস? তা হ্যাঁরে, বৌমার কি হয়েছিল? তোর শ্বশুর আমাদেরকে একটা খবর পর্যন্ত দিল না। আর তুইও তো দিতে পারতিস। খলিলকে সাথে করে শেষবারের মতো একবার দেখতে যেতাম।

জাকির সবকিছু চেপে গিয়ে বলল, মারা যাওয়ার পর আমার শ্বশুর খুব তড়িঘড়ি দাফনের ব্যবস্থা করলেন। তোমাদের ও বুবুদেরকে খবর দেয়ার কথা বলতে বললেন, সবাইকে খবর দিতে গেলে অনেক দেরি হয়ে যাবে। লাশ বেশিক্ষণ ঘরে রাখতে নেই।

দিলারা খানম বললেন, তোর শ্বশুর অবশ্য হাদিসের কথা বলেছেন। যাই হোক, তুই গোসল করে খাওয়া দাওয়া কর। আমি আরিফকে দুধ খাওয়াবার ব্যবস্থা করি।

সাদিয়ার মৃত্যুর খবর পেয়ে খলিল খুব দুঃখ পেল। সেও ছোট ভাইকে অনেক সান্তনা দিল।

নিহারবানু শুনে দেবরের কাছে দুঃখ প্রকাশ করলেও মনে মনে খুশি হল। ভাবল, পরীটা মরে ভালই হল, এবার জয়নাবের সাথে জাকিরের বিয়ে দেয়ার চেষ্টা করতে হবে।

জয়নাব নিহারবানুর ছোট বোন। ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত পড়েছে। দেখতে শুনতে ভালো। নিহারবানুর খুব ইচ্ছা ছিল, ছোট বোনকে জা করার। কিন্তু জাকির হঠাৎ করে সাদিয়াকে বিয়ে করে ফেলায় সে আশা পূরণ হয়নি। টাকার অভাবে এতদিন জয়নাবের বিয়ে হয়নি। তাই সাদিয়া মরে যেতে কয়েকদিন ভেবে ভেবে একটা বুদ্ধি আঁটল।

একদিন রাতে ঘুমোবার সময় নিহারবানু স্বামীকে বলল, তোমাকে একটা কথা বলতে চাই।

খলিল বলল, বল কি বলবে।

নিহারবানু বলল, আরিফের মা মারা গেছে। তার জন্যেই সংসার আলাদা হয়েছিল। এখন সে নেই। জাকির ভাইয়ের সংসার দেখবে কে? আম্মা আরিফকে সামলাবেন না সংসার দেখবেন? তাই বলছিলাম, আবার সংসার এক হয়ে গেলে কেমন হয়?

খলিল স্ত্রীর চাল বুঝতে পারল না। বলল, কথাটা তুমি ভালই বলেছ। জাকিরকে ও আম্মাকে কথাটা বলতে হবে।

পরের দিন সকালে খলিল জাকিরের সামনে আম্মাকে বলল, ছোট বৌ নেই। তুমি আরিফকে সামলাতেই হিমসিম খেয়ে যাচ্ছ, সংসার দেখবে কে? তাই আমি ও তোমার বড় বৌ বলছিলাম কি, দু'টো সংসার থাকার আর দরকার নেই। একসংসারে থাকলেই তো হয়। আফরোজা আরিফকে কোলে পিঠে করে মানুষ করবে।

নিহারবানু স্বামীর সঙ্গে এসেছে। স্বামীর কথা শেষ হতে বলল, আমার জন্য সংসার আলাদা হয়েছিল, সে জন্যে আমি মাফ চাইছি আম্মা। এই কথা বলে সে শাশুড়ীর পা জড়িয়ে ধরল।

দিলারা খানম কিছু বলার আগে জাকির বলল, ভাবিকে মাফ করে দাও আম্মা। যে নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হয়, তাকে আল্লাহ মাফ করে দেন।

দিলারা খানম বড় বৌয়ের মাথায় চুমো খেয়ে বললেন, আল্লাহ তোমাকে মাফ করুক। ভাই ভাই একসংসারে থাকবে, এটা তো খুব ভালো কথা।

নিহারবানু আরিফকে কোলে নিয়ে আদর করতে করতে সেখান থেকে চলে গেল।

সেদিন থেকে দুটো সংসার আবার এক হয়ে গেল।

এদিকে জাকিরের মন ভালো নেই। ব্যবসাপত্রে মন দিতে পারছে না। বড় ভাই ও ম্যানেজারের উপর সবকিছু ছেড়ে দিয়ে বেশিরভাগ সময় মসজিদে এবাদৎ বন্দেগী করে। সাদিয়ার মৃত্যু তার মনে ভীষণ আঘাত করেছে। কিছুতেই তাকে ভুলতে পারছে না। সব সময় চুপচাপ থাকে। ঘরে যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ আরিফকে বুকে জড়িয়ে চোখের পানি ফেলে।

একদিন জাকির সমেশপুরে শ্বশুরের সঙ্গে দেখা করতে গেল। গিয়ে দেখল, বাড়ি ঘর সব বিরান হয়ে পড়ে আছে। ঘরের উঠোনে নানারকম গাছপালা গজিয়েছে। কিন্তু সাদিয়ার কবর দেখে খুব অবাক হল। সেই প্রথম দিন যেমন দেখেছিল, তেমনি রয়েছে। কেউ যেন প্রতিদিন এর চারপাশ পরিস্কার করে দেয়। সাদিয়ার মৃত্যুর পরের দিন নেসার ফকির জাকিরকে বলে ছিলেন, তারা এখান থেকে চলে যাবেন। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি যাবেন, জাকির ভাবে নাই। ভগ্ন হৃদয়ে আরও আঘাত পেয়ে স্ত্রীর কবর জিয়ারত করে সুফিয়াদের বাড়িতে এল। তারপর এক সময় দুলাইভাইকে জিজ্ঞেস করল, আমার শ্বশুর শাশুড়ীরা কবে এখান থেকে চলে গেছেন, আপনি কি জানেন?

গোফরান বলল, না জানি না।

জাকির আর কিছু জিজ্ঞেস না করে বাড়ি চলে গেল।

সমেশপুর থেকে ফিরে জাকির আরও গম্ভীর হয়ে গেল। আগে যদিও একটু আধটু কারও সঙ্গে কথা বলত, এখন তাও আর বলে না।

দিলারা খানম একদিন বড় ছেলেকে বললেন, জাকির ছোট বৌকে ভুলতে পারছে না। সব সময় চুপচাপ থাকে। ঘরেও বেশিক্ষণ থাকে না। তুই ওকে বোঝাতে পারিস না?

খলিল বলল, আমি ওকে অনেক বুঝিয়েছি আম্মা। ব্যবসাপত্র মোটেই দেখে না। এক কাজ করুন, জাকিরের আবার বিয়ে দিন। তা হলে ছোট বৌয়ের শোক ভুলতে পারবে।

দিলারা খানম বললেন, আমিও সেই কথা ভাবছি। তুই মেয়ের খোঁজ কর। আমি ওকে বিয়ের কথা বলি।

নিহারবানু কিছুদিন থেকে জাকিরের সঙ্গে জয়নাবের বিয়ে দেয়ার কথা স্বামীকে বলে আসছে। খলিলের ও খুব ইচ্ছা। তাই মা যখন মেয়ে দেখতে বলল তখন খলিল বলল, মেয়ে আমার দেখা আছে। তাহমীনার ছোট খালা সব দিক দিয়ে ভালো। নামায কালাম পড়ে। কিছু লেখাপড়াও জানে।

জয়নাব অনেকবার বড় বোনের বাড়ি এসেছে। দিলারা খানম তাকে দেখেছেন। নেহাৎ খারাপ নয়, বড় বৌয়ের চেয়ে অনেক ভালো। ভাবলেন, দু'বোন জা হলে মিলে মিশে থাকবে। বললেন, জাকির রাজি হলে আমার কোনো অমত নেই।

খলিল একসময় কথাটা স্ত্রীকে জানাল।

নিহারবানু শুনে খুশিতে টগবগিয়ে উঠে বলল, এতদিনে আল্লাহ আমার মনের সাধ পূরণ করবে।

দিলারা খানম রাতের বেলা জাকিরকে বললেন, আমি তোর আবার বিয়ে দিতে চাই।

জাকির বিয়ের কথা শুনে চমকে উঠে বলল, না- না এ সম্ভব নয়। আমি আর বিয়ে করতে পারব না।

দিলারা খানম বললেন, কেন পারবি না। লোকে বৌ থাকতে আরও দু'টো তিনটে বিয়ে করে। আর তোর বৌ মারা গেছে। তুই বিয়ে করবি না কেন? বাকি জীবন কাটাবি কি করে? তা ছাড়া আরিফকে মানুষ করার কথা তোকে ভাবতে হবে। আমার বয়স হয়েছে, কতদিন আর বাঁচব। প্রয়োজনের তাগিদে করবি না কেন? কুরআন হাদিসে প্রয়োজনে চারটে পর্যন্ত বিয়ে করার নির্দেশ রয়েছে।

জাকির বলল, সেকথা আমি জানি; কিন্তু তবু আমি করব না। তুমি আমাকে মাফ কর আম্মা।

দিলারা খানম বললেন, তোর বড় ভাই বলছিল, তুই ব্যবসাপত্র কিছু দেখিস না, সব সময় মন খারাপ করে থাকিস। সেও তোর বিয়ে দিতে চায়। আর সেজন্যে মেয়েও দেখেছে।

জাকির বলল, তাই নাকি? তা মেয়েটা কে?

দিলারা খানম বললেন, তার ছোট শালী জয়নাব। তুই তো তাকে অনেকবার দেখেছিস।

জাকির অবাক হয়ে কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে বলল, জয়নাবের এখনও বিয়ে হয়নি? তা হলে তার তো বয়স অনেক হয়েছে।

দিলারা খানম বললেন, বড় বৌয়ের বাপ গরীব। আজকাল মেয়ে যতই ভালো হোক, সোনা-দানা, টাকা-পয়সা ছাড়া কেউ বিয়ে করতে চায় না। সেইজন্যে তার বাপ বিয়ে দিতে পারেনি।

জাকির বলল, দুনিয়ার অবস্থা দেখলে দুঃখ হয়। জয়নাবের মতো মেয়ের বিয়ে যদি টাকা পয়সার অভাবে না হয়, তা হলে কার হবে? কথাটা তোমরা কেউ এতদিন আমাকে বলেনি কেন? ভাইয়াকে জয়নাবের অন্যত্র বিয়ের ব্যবস্থা করতে বল। যা টাকা পয়সা লাগে আমি দেব। ওকে বিয়ে করার ব্যাপারে আমাকে আর কোনো কথা বলো না।

দিলারা খানম একটু রাগের সঙ্গে বললেন, বৌ কি কারো মরে না? না বৌ মরে গেলে কেউ বিয়ে করে না? আরিফকে মানুষ করার কথাও ভাববি না?

আম্মা রেগে গেছে বুঝতে পেরে জাকির বলল, তুমি রাগ করো না আম্মা। কে বিয়ে করছে না করছে তা আমার জানার দরকার নেই। আর আরিফের কথা যে বললে, তাকে আল্লাহপাক মানুষ করবেন। তিনি যেমন সৃষ্টিকর্তা তেমনি পালনকর্তা। আমি তোমার কথার অমর্যদা কোনো দিন করিনি। কিন্তু তোমার এই কথা রাখতে পারব না। আমাকে মাফ কর আম্মা, কথা শেষ করে চোখ মুছতে লাগল।

দিলারা খানম ছেলের চোখে পানি দেখে আর কিছু বললেন না। পরের দিন খলিলকে জাকিরের অমতের কথা জানালেন।

খলিল বলল, আরও কিছুদিন না হয় দেখা যাক। এখনও জাকির ছোট বৌয়ের শোক ভুলতে পারছে না।

দিলারা খানম একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, তাই দেখ।

নিহারবানু স্বামীর কাছ থেকে জাকিরের অমতের কথা শুনে বলল, ঐ পরীটা জাকির ভাইকে মরার আগে যাদু করে গেছে। তাই বিয়ে করতে চাচ্ছে না। তুমি কোনো হুঁজুরের কাছে গিয়ে যাদু কাটাবার ব্যবস্থা কর। দেখবে তখন আর অমত করবে না।

খলিল স্ত্রীর কথা বিশ্বাস করল না। কিন্তু তবু এক হুঁজুরের কাছে গিয়ে জাকিরকে দ্বিতীয় বিবাহে রাজি করবার জন্য তদবীর করে নিয়ে এল। কিন্তু তাতেও কোনো কাজ হল না।

তিন চার মাস অপেক্ষা করে নিহারবানু একদিন দেবরের মন বোঝার জন্য তাকে জিজ্ঞেস করল, জাকির ভাই, তুমি বিয়ে করতে চাচ্ছ না কেন? জয়নাবকে তোমার যদি পছন্দ না হয়, তা হলে অন্য মেয়েকে কর।

জাকির বলল, না ভাবি, পছন্দ অপছন্দের জন্য নয়। আসলে আমি আর বিয়েই করব না। তবে আরিফের জন্য যা একটু চিন্তা। ওকে মানুষ করতে তোমাদের যদি অসুবিধে হয়, তা হলে বল, আমি অন্য ব্যবস্থা করব।

নিহারবানু বলল, আরিফকে মানুষ করতে অসুবিধে হবে কেন? আমিও আম্মা রয়েছি। কিন্তু তোমারও তো সুবিধে অসুবিধে আছে? সে সব তো আর আমাদের দ্বারা পূরণ হবে না?

জাকির বলল, আমার কোনো অসুবিধে নেই। মানুষের জীবন আর কয়দিনের? যে কয়টা দিন বাঁচব, এই ভাবেই কাটিয়ে দেব।

নিহারবানু এরপর আর কি বলবে ভেবে না পেয়ে চুপ করে গেল।

এর কিছুদিন পর হঠাৎ একদিন দিলারা খানম বুকের ব্যথায় মারা গেলেন। মৃত্যুর খবর শুনে সুফিয়া ও গোফরান এল। সুফিয়া ভীষণ কান্নাকাটি শুরু করল। গোফরান অনেক কিছু বলে প্রবোধ দিতে লাগল। তাতে কাজ না হতে বলল, তুমি এত কিছু জেনেও অবুঝের মত বিলাপ করে কাঁদছ? হাদিসে পড়নি" রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, যে মৃত ব্যক্তির জন্য মুখমণ্ডলে আঘাত করে, কাপড় ছিঁড়ে ফেলে এবং বর্বর যুগের কথা আওড়াইয়া বিলাপ করে, সে আমাদের দলভুক্ত নহে।" তারপর গোফরান স্ত্রীকে বলল, উচ্চস্বরে বিলাপ না করে নীরবে চোখের পানি ফেলতে পার। যারা উচ্চস্বরে বিলাপ করে কাঁদে তাদের সম্বন্ধে হাদিসে উল্লেখ আছে, রসুল (দঃ) বলিয়াছেন, "উচ্চস্বরে যাহার জন্য বিলাপ করা হয়, বিচার দিবসে তাহার দ্বারা তাহাকে শাস্তি দেওয়া হইবে।"[১]

স্বামীর মুখে হাদিসের কথা শুনে সুফিয়া বিলাপ বন্ধ করে নীরবে চোখের পানি ফেলতে ফেলতে বড় ভাবিকে ও আত্মিয়দেরকে চিৎকার করে কাঁদতে নিষেধ করতে লাগল।

দিলারা খানমের দাফন কাফনের পর ঐদিন রাতে দু'শালা ও তাদের আত্মিয়স্বজনদের নিয়ে গোফরান শাশুড়ীর কলুখানির কথা তুলল। সবাইয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক হল, চল্লিশ দিনে কুলখানি হবে।

চল্লিশ দিনের কথা শুনে গোফরান আপত্তি করে বলল, আমাদের দেশে যে সাতদিন, চৌদ্দ দিন, একুশ দিন ও চল্লিশ দিনে কুলখানি করার নিয়ম আছে তা বেদাত। আর কুলখানি করতেই হবে, একথা বিশ্বাস করাও বেদাত। তবে মৃত ব্যক্তির রুহের মাগফেরাতের জন্য যে কোনো দিনে কুরআন খতম, ছোলাপড়া, মিলাদ দো'য়া অথবা ফকির মিসকীন খাওয়ান ভালো কাজ। তবে সেটা করতেই হবে, না করলে অন্যায় হবে, এরকম ভাবা বেদাত।

গোফরানের কথার প্রতিবাদ কেউ করতে পারল না।

আল্লাহপাকের মহিমা মানুষের বোঝার অসাধ্য। মায়ের মৃত্যুর পর জাকির একেবারে ভেঙ্গে পড়ল। এতদিন সাদিয়ার মৃত্যুর আঘাত সহ্য করতে পারলেও মায়ের মৃত্যুর আঘাত সহ্য করতে পারল না। তিন চার মাসের মধ্যে অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ে গেল। ডাক্তাররা চিকিৎসা করেও কিছু করতে পারল না। দিন দিন জাকিরের অবস্থার আরও অবনতি ঘটল। শেষে ডাক্তারের পরামর্শে খলিল তাকে সিরাজগঞ্জ সদর হাসপাতালে ভর্তি করে দিল। সেখানেও তার অবস্থার উন্নতি হল না। ভর্তি হওয়ার তিন দিন পর জাকির মারা গেল।

(১) বর্ণনায় : হযরত মুগীরাহ বিন শোবাহ (রাঃ)-বুখারী, মুসলীম।

মারা যাওয়ার আগে জাকির বড় ভাইকে জিজ্ঞেস করল, বুবু দুলভাই আসেনি?

খলিল বলল, না, আসেনি।

জাকির তিন বছরের আরিফের একটা হাত নিয়ে বড় ভাইয়ের হাতে দিয়ে চোখের পানি ফেলতে ফেলতে বলল, ভাইয়া, একে তোমার হাতে দিয়ে গেলাম আজ থেকে তুমি ও ভাবি ওর মা বাবা। তারপর ভাবির দিকে তাকিয়ে বলল, ভাবি, তুমি ওকে মায়ের স্নেহ দিয়ে মানুষ করো। তোমরা আরিফকে লেখাপড়া করিয়ে মানুষের মতো মানুষ করো। বুবু ও দুলাভাই এখনও এল না কেন? বুবু যদি আরিফকে মানুষ করতে চাই, তা হলে তোমরা যা ভালো বুঝবে করবে। তারপর দু'হাত তুলে দো'য়া করল, "আল্লাহপাক, তুমি সমস্ত আকাশমণ্ডলী ও ভুমণ্ডলের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা। তোমার সমতুল্য আর কেউ নেই। তুমি সর্বশক্তিমান মহান প্রভু। তোমার রহমতের ভাণ্ডার অফুরন্ত। তুমি আমার আরিফের উপর সেই ভান্ডার থেকে কণামাত্র বর্ষণ করো। তাকে তোমার প্রিয় বান্দাদের সামিল করে নিও।" মোনাজাত শেষ করে মুখে হাত বুলোবার সময় লা ইলাহা ইল্লা লাহু মোহাম্মাদুর ..... কথাটা আর শেষ করতে পারল না, হাত দু'টো দু'পাশে পড়ে গেল আর পুরো শরীরটা একবার কেঁপে উঠে নিথর হয়ে গেল।

তাই দেখে খলিল তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাকার জন্য বারান্দায় এসে একজন নার্সকে দেখতে পেয়ে বলল, আপা, আমার ভাই কথা বলতে বলতে হঠাৎ চুপ করে নিথর হয়ে গেছে।

নার্স এসে জাকিরের নাড়ী ধরে বুঝতে পারল, মারা গেছে। বলল, উনি মারা গেছেন। আপনারা অপেক্ষা করুন, আমি ডাক্তারের কাছে রিপোর্ট করছি। একটু পরে ডাক্তার এসে জাকিরকে পরীক্ষা করে নার্সকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিতে বলে চলে গেলেন।

আরিফ খলিলের একটা হাত ধরে বলল, আব্বুর কি হয়েছে চাচা? ওরা আব্বুকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিল কেন?

খলিলের চোখ থেকে পানি পড়ছিল। চোখ মুছে তাকে কোলে নিয়ে বলল, আল্লাহ তোমার আব্বুকে দুনিয়া থেকে তুলে নিয়েছে বাবা।

আরিফ আবার বলল, আল্লাহ আব্বুকে কোথায় তুলে নিয়েছেন বলুন না চাচা?

খলিল এতটুকু বাচ্চাকে কি বলবে ভেবে না পেয়ে শুধু চোখের পানি ফেলতে লাগল।

আরিফ চাচার দাড়ি ধরে মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, আপনি কাঁদছেন কেন? আল্লাহ আব্বুকে কোথায় তুলে নিয়েছেন বলুন না চাচা।

এবার খলিল ডুকরে উঠে বলল, তুমি চুপ কর বাবা চুপ কর। তোমার আব্বাকে আল্লাহ নিজের কাছে তুলে নিয়েছে।

আব্বু কবে আসবেন চাচা?

আল্লাহ যাকে নিয়ে নেয়, সে আর ফিরে আসে না।

তা হলে আমি কাকে আব্বু বলে ডাকব? কে আমাকে গোসল করাবে? কে খাওয়াবে? কার কাছে আমি ঘুমাব?

কেন আমি ও তোমার চাচ্চিআম্মা রয়েছি। আজ থেকে আমরাই তোমার সবকিছু করব।

আচ্ছা চাচা, আব্বু কি আর কোনো দিন ফিরে আসবে না?

খলিল প্রবোধ দেবার জন্য বলল, কিছুদিন পরে ফিরে আসবে।

আপনি মিথ্যে বলছেন কেন? আব্বু আর ফিরে আসবে না। আমি আব্বুকে আম্মুর কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম। আব্বু বলেছিল, আল্লাহ আম্মুকে তুলে নিয়েছে। আর কোনোদিন ফিরে আসবে না।

খলিল বলল, হ্যাঁ তোমার আব্বু ঠিক কথা বলেছে। তারপর স্ত্রীর কাছে গিয়ে বলল, একে একটু ধর। আমি ডাক্তারের কাছে গিয়ে লাশ নেয়ার ব্যবস্থা করি।

নিহারবানু বিরক্ত কণ্ঠে বলল, অতবড় ছেলেকে কোলে নিতে পারব না। দাঁড় করিয়ে রেখে যাও।

খলিল স্ত্রীর কথা শুনে রেগে গেল। হাসপাতাল বলে কিছু বলল না। আরিফকে কোল থেকে নামিয়ে বলল, তোমার চাচিআম্মার কাছে দাঁড়াও, আমি আসছি। তারপর ডাক্তারের কাছে গেল।

সুফিয়া ও গোফরান জাকিরকে ঘরে এসে কয়েকবার দেখে গেছে। কিন্তু তারা হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার কথা জানে না। যেদিন জাকির মারা গেল সেদিন তারা আবার দেখতে এল।

খলিল ও নিহারবানু হাসপাতালে। ছেলেমেয়েরা সবাই বাড়িতে। তারা জাকিরের মৃত্যুর খবর জানে না। খলিলের বড় মেয়ে তাহমীনা চাচার অসুখ বেশি শুনে কয়েক দিন আগে শ্বশুরবাড়ি থেকে এসেছে।

ফুপা ফুপিকে দেখে তাহমীনা বলল, চাচাকে আজ চারদিন হল হাসপাতালে ভর্তি করেছে। আব্বা আম্মার সঙ্গে আরিফও সেখানে গেছে।

সুফিয়া ও গোফরান যখন হাসপাতালে গিয়ে পৌঁছাল তখন খলিল ট্রাক ভাড়া করে লাশ নিয়ে আসার ব্যবস্থা সম্পন্ন করেছে।

সুফিয়া দেখে শুনে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। গোফরানের চোখ দিয়ে ও পানি পড়তে লাগল।

খলিল বড় বোনকে সান্তনা দিয়ে বলল, কেঁদে আর কি করবে বুবু, সবর কর। দু'দিন আগে পরে সবাইকে যেতে হবে।

আরিফকে চুপ করে একধারে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সুফিয়া তাকে কোলে তুলে নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল, তুই এতিম হয়ে গেলিরে বাপ। আল্লাহ তোর উপর রহম করুক।

খলিল সবাইকে নিয়ে ট্রাকে করে লাশসহ বাড়ি ফিরল।

দাফনের পর খলিলের চাচাতো ভাইয়েরা খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করল।

পরের দিন সুফিয়া বাড়ি যাবার আগে স্বামীকে বলল, আমি আরিফকে নিয়ে যেতে চাই।

গোফরান বলল, এখন নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। খলিল ও তার বৌ কিছু মনে করতে পারে। জাকিরের কুলখানির সময় বলা যাবে।

সুফিয়া স্বামীর কথায় প্রতিবাদ করল না। যাওয়ার সময় ভাই-ভাবিকে বলে গেল, আরিফের যেন এতটুকু অযত্ন না হয়।

সুফিয়া চলে যাওয়ার পর আরিফ ফুপু যাব ফুপু যাব বলে কাঁদতে শুরু করল। সবাই তার কান্না থামাবার চেষ্টা করেও সফল হল না। শেষে খলিল তাকে কোলে নিয়ে ফুপুর কাছে যাওয়ার কথা বলে বাজারে এসে নানারকম খেলনা, চকলেট ও বিস্কুট কিনে দিয়ে কান্না থামাল। কিন্তু ঘরে ফিরে এসে আবার কাঁদতে শুরু করল। এভাবে দিন যত যেতে লাগল আরিফ তত কান্নাকাটি করতে লাগল। তাহমিনা এখনও শ্বশুরবাড়ি যাইনি। কুলখানির পর যাবে। সেইই আরিফকে দেখাশোনা করছে। তার কাছে কিছুটা শান্ত থাকে।

আরিফকে নিয়ে নিহারবানু অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। তার মনে হল, এর মা বাপ মরে গিয়ে আমার গলায় ফাঁস ঝুলিয়ে দিয়ে গেছে। ভেবে রাখল, সুফিয়া বুবু এলে তার গলায় ঝুলিয়ে দিতে হবে। হঠাৎ তার মন বলে উঠল, সুফিয়ার কাছে মানুষ হয়ে ফিরে এসে তার বাপের সম্পত্তি নিয়ে নেবে। তার বাপেরই তো সব। তাহমীনার বাপের আর কতটুকু? তোরা পথে বসে যাবি। তার বাপ তোদেরকে সাহায্য করত; তাই বলে সে কি আর করবে? তার চেয়ে আরিফকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করলে পথের কাঁটা দূর হয়ে যাবে। এইসব কথা নিহারবানু কয়েকদিন ধরে চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নিল, ভাতের সঙ্গে বিষ দিয়ে ওকে মেরে ফেলবে।

একদিন রাতে সব ছেলেমেয়েদেরকে খাওয়াবার সময় আরিফের ভাতে ইঁদুর মারা বিষ মাখিয়ে তাতে পাতলা ডাল ঢেলে খেতে দিল। ভাবল, মরে গেলে বলবে, গলায় ভাত আটকে মারা গেছে। আর যদি পায়খানা বমি হয়, তা হলে বলবে, ভেদবমী হয়ে মারা গেছে।

আরিফ খেতে বসে ভাতের দিকে চেয়ে চুপ করে বসে রইল।

নিহারবানু বলল, কিরে বসে আছিস কেন? ভাত খেয়ে নে।

আরিফ বলল, আমাকে অন্য প্লেটে ভাত বেড়ে দাও। এই ভাত খাব না।

নিহারবানু ঝেঁজিয়ে উঠে বলল, কেন?

আরিফ কিছু না বলে চুপ করে রইল।

নিহারবানু আরও রেগে গিয়ে বলল, দেখ আরিফ, আমাকে বেশি রাগাবি না। ভালই ভালই খেয়ে নে। আমার অনেক কাজ পড়ে আছে।

তাহমীনাও খাচ্ছিল। বলল, জিদ ধরে না সোনাভাই, খেয়ে নাও।

আরিফ বলল, আমি এই ভাত খাব না।

নিহারবানু ঝংকার দিয়ে বলল, তোকে এই ভাতই খেতে হবে, অন্য ভাত দেব না।

এমন সময় খলিল ঘরে ফিরে স্ত্রীর বড় গলা শুনতে পেয়ে খাবার ঘরে এস বলল, কি ব্যাপার? এত চেঁচামেচি করছ কেন?

নিহারবানু স্বামীকে দেখে একটু ঘাবড়ে গেল; কিন্তু দমল না। বড় গলাতেই বলল, এই নবাব পূতের কথা শোন, উনি ডাল মাখান ভাত খাবেন না, অন্য ভাত দিতে হবে।

খলিল বলল, তাতে এত রেগে গেছ কেন? ডাল মাখান ভাত না খায় অন্য ভাত দাও।

নিহারবানু রাগের সঙ্গে বলল, কেন এই ভাত কি দোষ করল? এতগুলো ভাত নষ্ট হবে?

খলিল আরিফের পাশে বসে বলল, নষ্ট হবে কেন? এই প্লেটে আমাকে দাও। ওকে অন্য প্লেটে ভাত বেড়ে দাও।

নিহারবানুর বুকটা ছ্যাৎ করে উঠল।

সে কিছু বলার আগে আরিফ বলে উঠল, না চাচা, আপনি এই ভাত খাবেন না।

খলিল বলল, কেন খেলে কি হবে? তারপর স্ত্রীকে বললেন, কই যা বললাম তাই কর।

নিহারবানু আরিফের ভাতের প্লেট সরিয়ে একপাশে রেখে অন্য দু'টো প্লেটে ভাত বেড়ে তাদেরকে খেতে দিল।

খলিল আরিফকে খেতে বলে নিজেও খেতে শুরু করল।

এদিকে তাদের পোষা বিড়ালটা এতক্ষণ একপাশে বসেছিল। নিহারবানু তার দিকে ভাতের প্লেটটা সরিয়ে রেখেছিল। সবাইয়ের অলক্ষ্যে বিড়ালটা সেই ভাত খেয়ে ম্যাঁও ম্যাঁও করে আর্তনাদ করতে করতে গড়াগড়ি দিতে লাগল।

খলিলের ছোট ছেলেটা ভাত খেয়ে চলে গেলেও তাহমীনা ও আফরোজা সেখানে ছিল। তাদের মধ্যে তাহমীনা বিড়ালটাকে ভাত খেতে দেখেছে। তারপর তাকে ঐ রকম করতে দেখে বলল, আব্বা দেখ দেখ, বিড়ালটা আরিফের ভাত খেয়ে কেমন করছে।

তাহমীনার কথায় সবাই চেয়ে দেখল, বিড়ালটা ছটফট করতে করতে নিথর হয়ে গেল।

আফরোজা বলে উঠল, ঐ ভাত আরিফ খেলে, সেও মরে যেত।

খলিল স্ত্রীর দুরভিসন্ধি বুঝতে পেরে ভীষণ রেগে গেল। স্ত্রীকে শাস্তি দেয়ার জন্য খাওয়া বন্ধ করে উঠে দাঁড়াতে উদ্দ্যত হলে আরিফ তার জামা ধরে বলল, চাচিআম্মাকে কিছু বলবেন না। হায়াৎ মউত আল্লাহপাকের হাতে।

এতটুকু বাচ্চার কথা শুনে খলিলের চোখে পানি এসে গেল। আর ভাত খেতে পারল না। হাত মুখ ধুয়ে আরিফকে কোলে তুলে নিয়ে তার দু'গালে কয়েকবার চুমো খেয়ে বলল, খুব দামি কথা বলেছ বাবা। তারপর স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বলল, যাকে তুমি মেরে ফেলতে চেয়েছিল, সেই তোমাকে শাস্তি থেকে বাঁচিয়ে দিল। আবার যদি এর কোনো ক্ষতি করার চেষ্টা কর, তা হলে আমি তোমাকেও শেষ করে দেব। এই কথা বলে সেখান থেকে চলে গেল।

সে রাতে খলিল আরিফকে নিয়ে অন্য ঘরে ঘুমাল। সব ছেলে মেয়েরা ঘুমিয়ে যাওয়ার পর স্ত্রীর রুমে এসে গম্ভীরস্বরে তাকে জিজ্ঞেস করল, আরিফকে মেরে ফেলতে চেয়েছিলে কেন?

নিহারবানু স্বামীর গম্ভীরস্বর শুনে ভয় পেয়ে চুপ করে রইল।

খলিল বলল, কি হল, আমার কথার উত্তর দিচ্ছ না কেন?

নিহারবানু তবু চুপ করে রইল।

খলিল বলল, যার বাপের টাকায় আজ আল্লাহ আমাদেরকে সুখে রেখেছে, তার মাসুম বাচ্চাকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলতে তোমার বিবেকে এতটুকু বাধল না? তুমি না ছেলেমেয়ের মা? তুমি মানুষ না শয়তান। এই সব কথা বলে ভীষণ মারধর করতে লাগল।

নিহারবানু মার সহ্য করতে না পেরে স্বামীর পা ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলল, আমি আর কখনও এমন কাজ করব না। এবারের মতো মাফ করে দাও।

খলিল বলল, আমি মাফ করলেও আল্লাহ মাফ করবে না। আল্লাহ তোমাকে এত সুখে রেখেছে, তবু তোমার মন ভরে না। ফেরেস্তার মতো ছেলেকে মেরে ফেলে তার সব সম্পত্তি ভোগ করতে চাও। একথা জান না, সব কিছুর মালিক আল্লাহ। তিনি যাকে ইচ্ছা ধনী গরিব করেন? তারপর মার থামিয়ে বলল, আজকের মতো মাফ করে দিলাম। যদি আমার ঘর করতে চাও, তা হলে শয়তানি বুদ্ধি ছেড়ে দাও। নচেৎ চিরকালের জন্য বিদায় করে দেব।

পরের দিন খলিলের আরিফকে ছেড়ে আড়তে যেতে মন চাইল না। তাই সে আরিফকে সাথে নিয়ে ঘরে রইল।

চাচাকে ঘরে থাকতে দেখে আরিফ বলল, চাচা আপনি আড়তে যান। আল্লাহ আমাকে দেখবে।

খলিল গতরাতে ভাত খাওয়া নিয়ে আরিফের কার্যকলাপে খুব অবাক হয়েছিল। এখন আবার তার কথা শুনে আরও বেশি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা আরিফ, তুমি কি করে জানতে পারলে তোমার চাচিআম্মা ভাতে বিষ দিয়েছে?

আরিফ বলল, তা বলতে পারব না, তবে আমার মন বলল, ঐ ভাত খেলে আমি মরে যাব।

খলিল আবার জিজ্ঞেস করল, তোমার বিপদ হতে পারে ভেবে আমি দোকানে যেতে চাচ্ছি না, এ কথা তুমি জানলে কেমন করে?

আরিফ বলল, এটাও আমার মন বলল।

খলিল তার কথা শুনে খুব অবাক হয়ে ভাবল, আরিফের মধ্যে কিছু অলৌকিক ক্ষমতা আছে। তাকে আর কিছু জিজ্ঞেস না করে তাহমীনাকে ডেকে বলল, তুই সব সময় আরিফকে নিয়ে থাকবি। তারপর সে আড়তে যাওয়ার সময় স্ত্রীকে বলল, গতরাতের কথা মনে আছে তো? আরিফের কিছু হলে তুমিও বাঁচতে পারবে না। কথা শেষ করে চলে গেল।

নিহারবানু ধরা পড়ে এবং স্বামীর হাতে মারধর খেয়ে আরিফের উপর আরও রেগে রয়েছে। এখন স্বামীর কথা শুনে সেই রাগ আরও বেড়ে গেল। স্বামী চলে যাওয়ার পর ভেবে রাখল, ঐ বিচ্ছুকে যদি শেষ না করেছি তো আমি বাপের বেটি নই।

শয়তানি বুদ্ধি একবার যার মাথায় ঢুকে, তাকে যতই শাসন করা হোক না কেন, যত সৎ উপদেশ দেয়া হোক না কেন অথবা ভয় দেখানো হোক না কেন, তার কোনো

পরিবর্তন হয় না। তাই নিহারবানুর মাথায় যে শয়তানি বুদ্ধি ঢুকেছে, তা স্বামীর শাসনে এবং সৎ উপদেশে কোনো কাজ হল না। সে সুযোগের অপেক্ষায় রইল।

তাহমীনা ছোট চাচির কাছে লেখাপড়া করেছে, ধর্মীয় বইও অনেক পড়েছে। তার ফলে সে তাকে যতটুকু জেনেছে এবং মায়ের কাছে যা শুনেছে, তাতে করে তাকে পরী বলে ভেবেছে। কিন্তু ছোট চাচির মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু দেখেনি। তাই তার মধুর ব্যবহারে তাকে খুব শ্রদ্ধা করত। এখন আরিফের সবকিছু দেখেশুনে তার মনে হল, ছোট চাচি পরী বলে তার পেটের ছেলে আগাম অনেক কিছু জানতে পারে। ভাত খাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে বুঝতে পারল, মা আরিফের দুষমন। তবু মাকে সাহস করে কিছু বলতে পারল না। আরিফকে সব সময় আগলে রাখল। পরের দিন থেকে তাকে নিজের কাছে নিয়ে ঘুমাতে লাগল।

নিহারবানু দিনের বেলা কাজে ব্যস্ত থাকলেও রাতে ঘুমাতে পারে না। কি ভাবে পরীর বাচ্চাকে শেষ করবে সারারাত সেই কথা চিন্তা করে। একদিন গভীর রাতে শুয়ে শুয়ে ঐ কথা চিন্তা করতে করতে হঠাৎ তার মন বলে উঠল, যে ছেলে তোর মনের শান্তি কেড়ে নিয়েছে, যার জন্যে তুই স্বামীর হাতে মার খেলি, যে নাকি তোর রাতের ঘুম হারাম করে দিয়েছে, তাকে এখনই গলাটিপে মেরে ফেল। এই সুযোগ, সবাই এখন ঘুমিয়ে আছে। কেউ টেরও পাবে না। কথাটা নিহারবানুর খুব মনঃপুত হল। আস্তে আস্তে বিছানা থেকে নেমে স্বামীর দিকে তাকিয়ে দেখল, সে নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে। তারপর ধীরে ধীরে পাশের ঘরের মাঝখানের দরজা আস্তে করে খুলে খাটের কাছে গিয়ে দেখল, আরিফ তাহমীনার পাশে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। আরিফের গলার দিকে হাত বাড়াতে গিয়ে ভয়ে তার গা কেঁপে উঠল। তখন তার মন বলে উঠল, এই সুযোগ আর পাবি না, যা করার তাড়াতাড়ি করে ফেল। নিহারবানু মন শক্ত করে দু'হাত বাড়িয়ে যখন আরিফের গলা ধরতে গেল তখন তার হাত অবশ হয়ে গেল। মনে হল, কেউ যেন তার হাত দু'টো শক্ত করে ধরে রেখেছে। ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি হাত টেনে নিল। এভাবে দু'তিন বার চেষ্টা করল, কিন্তু প্রতিবারেই কেউ যেন তার হাত শক্ত করে ধরে রাখে। শেষে নিহারবানু খুব ভয় পেল। ভাবল, পরীটা মরে গিয়েও ছেলেকে পাহারা দিচ্ছে।

এমন সময় আরিফ পাশ ফিরে তাহমীনাকে জড়িয়ে ধরল।

তাহমীনার ঘুম ভেঙ্গে গেল। ঘরে হারিকেনের বাতি ছোট করে জ্বালান ছিল। তাহমীনা তাকিয়ে সেই আলোতে দেখতে পেল, তাদের খাটের কাছে মা দাঁড়িয়ে আছে। ব্যাপারটা তার কাছে সন্দেহজনক মনে হল। ভাবল, আম্মা কি তা হলে আরিফের কোনো ক্ষতি করতে এসেছে? তখন তার মাথায় একটা বুদ্ধি এল। সে আরিফকে নাড়া দিয়ে বলল, কিরে আরিফ নড়ছিস কেন? পেসাব করবি নাকি?

নিহারবানু মনে করল, তাহমীনা তাকে দেখেনি। তাড়াতাড়ি নিজের রুমে ফিরে এসে দরজা আস্তে করে লাগিয়ে দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

মা চলে যাওয়ার পর তাহমীনা ঘটনাটা চিন্তা করে বাকি রাত জেগে কাটাল। ভাবল, ব্যাপারটা আব্বাকে জানান দরকার। আবার ভাবল, বললে আব্বা আম্মাকে

আস্ত রাখবে না। রাগের মাথায় একটা কেলেংকারী করে ফেলতে পারে। সেদিন রাতে যখন নিহারবানুকে মেরেছিল তখন অন্য ভাইবোনেরা ঘুমিয়ে পড়লেও তাহমীনা জেগেছিল। আগেই বুঝতে পেরেছিল আব্বা আম্মাকে ভীষণ মারধর করবে। তাই ঘুমের ভান করে জেগেছিল। আব্বা আম্মাকে মারতে দেখেছিল এবং তাদের কথাবার্তা ও শুনেছিল। তারপর আম্মার আজকের মনোভাব বুঝতে পেরে ভেবে রাখল, এবারে ফুপু এলে আরিফকে নিয়ে চলে যেতে বলবে।

এই ঘটনার পর নিহারবানুর দৃঢ় ধারণা হল, সে যা চায়, তা কখনো সম্ভব হবে না। পরীর ছেলের ক্ষতি করলে, পরীটা আমার ছেলেমেয়ের ক্ষতি করবে। এই কথা ভেবে আরিফকে মেরে ফেলার চিন্তা মন থেকে দূর করে দিল।

আজ জাকিরের কুলখানি। গ্রামের ধনী, গরিব, এতিম, মিসকীন ও আত্মিয়স্বজনদের দাওয়াত দেয়া হয়েছে। সুফিয়া ও গোফরান একদিন আগে এসেছে। সকাল থেকে মক্তবের ছাত্র ও মৌলবীরা ক্বুরআন খতম পড়ছে। আর অন্যান্য লোকজনেরা ছোলা গুনছে। জোহরের নামাযের পর মিলাদ ও দো'য়া খায়ের হওয়ার পর খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অনেকে মাইকে সবিনা খতমের কথা বলেছিল। খলিল রাজি হলেও গোফরান হয়নি। সে সবাইকে বুঝিয়ে বলল, নামাযে বা ক্বুরআন খতমে মাইক ব্যবহার করা সম্বন্ধে বড় বড় ওলামায়ে কেরামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। যাঁরা মাইক ব্যবহার না জায়েজ বলেছে, তাঁরা ক্বুরআন হাদিসের অনেক প্রমাণ পেশ করেছেন। সেগুলো বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে একটা প্রধান কারণ বলতে পারি। সেটা হল, ওঁরা বলেন, মাইক বিদ্যুতে চলে। আর বিদ্যুৎ হল আগুন। ক্বুরআনকে আগুনের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করা না জায়েজ। আর যাঁরা এই সমস্ত কাজে মাইক জায়েজ বলেছেন, তাঁরা শুধু আযান এবং যে মহফিলে বহুলোকের সমাগম হয় অথবা যে মসজিদে বা ময়দানে বহুলোক নামায পড়ার জন্য আসে, কেবল সেখানেই মাইক ব্যবহার করতে বলেছেন। তবে মাইকের সাউন্ড বক্স বসাবার নিয়মও বলে দিয়েছেন। ইমামের বা বক্তার মাউথপীস থেকে যতদূর আওয়াজ শোনা যায়, তার ভিতর অন্য সাউন্ডবক্স বসাতে নিষেধ করেছেন। বরং যেখানে থেকে ইমামের বা বক্তার আওয়াজ শোনা না যায়, সেখানে বসাতে বলেছেন। আমরা সেসব দিকে খেয়াল না করে ইচ্ছামত ঘন ঘন সাউন্ড বক্স বসাই। যার ফলে মুসল্লীদের বা শ্রোতাদের কান ঝালা পালা হয়। আর মসজিদে বা মহফিলে গুটিকয়েক লোকের জন্যও মাইক ব্যবহার করি। এটা ইসলামিক দৃষ্টিতে নাজায়েজ। এই যেমন আপনারা মাইকে সবিনা খতম করার কথা বলছেন, এটা একেবারেই অনুচিত, কারণ আল্লাহপাক ক্বুরআন মজিদে বলেছেন, "আর যখন ক্বুরআন পাঠ করা হয় তখন তাতে কান লাগিয়ে রাখ এবং নিশ্চুপ থাক, যাতে তোমাদের উপর রহমত হয়।"[১] এবার আপনারই বলুন, মাইকে ক্বুরআন পড়ার সময় আমারা কি সবাই চুপ করে বসে শুনি। তা ছাড়া মাইকের শব্দ অনেক দূরের লোকের কানে যাবে। তাদের সকলের পক্ষে যেখানে খতম পড়া হচ্ছে সেখানে এসে বসে বসে শোনা সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে আমরাই তাদেরকে আল্লাহর আইনের

(১) আল ক্বুরান-পারা-৯, আয়াত নং-২০৪।

বরখেলাপ করাচ্ছি। তা ছাড়াও পেসাব পায়খানা করার সময় মাইকে ক্বুরআন পড়ার শব্দ কানে যাচ্ছে। কি সাংঘাতিক বেয়াদবীর মধ্যে তাদেরকে ফেলে দেয়া হচ্ছে। অনেক সময় আশ পাশের ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার পড়ার বিঘ্ন ঘটায়। এই রকম বিভিন্ন অসুবিধের সৃষ্টি করে মাইক। অবশ্য সব জিনিসের যেমন ভালো মন্দ আছে। তেমনি মাইকেরও আছে। প্রকৃত জ্ঞানীরা উপযুক্ত কারণে সব জিনিসের ভালো দিকটা ব্যবহার করার অনুমতি দিয়ে থাকেন। এই সামান্য কয়েকটা লোকের জন্য এবং লোকের কাছে বড়লোকি দেখবার জন্য মাইকে ক্বুরআন খতম জায়েজ হতে পারে না।

খলিল বলল, একথাগুলো কি আলেমরা বা হাফেজরা জানেন না? ওঁদেরকে দাওয়াত দিতে গেলে ওঁরাই আগে মাইকের ব্যবস্থা করতে বলেন।

গোফরান বলল, যারা প্রকৃত আলেম বা হাফেজ, অর্থাৎ যাঁরা আল্লাহ ও রসুল (দঃ) কে সন্তুষ্ট করার জন্য আলেম বা হাফেজ হয়েছেন এবং এলেম অনুযায়ী আমল করে থাকেন, তাঁরা কোনোদিন মাইকের ব্যবস্থা করতে বলনে না। বরং বেআমল আলেম ও হাফেজরাই বলে থাকেন। আজকাল প্রকৃত আলেম ও হাফেজদের সংখ্যা খুব কম। তাই প্রায় ছোট ছোট মহফিলে বা মসজিদে, এমন কি কোনো ঘরোয়া মহফিলে সবিনা বা মিলাদ মাহফিলে মাইক ব্যবহার করা হচ্ছে। যা নাকি একেবারেই অনুচিত।

খলিল বলল, আলেম ও হাফেজরাই যদি আল্লাহ ও রসুলের (দঃ) হুকুম মেনে না চলেন, তা হলে আমাদের মতো সাধারণ মানুষ কি করবে?

গোফরান বলল, আইন সবারই জন্য এক। অজ্ঞানতাই সব থেকে বড় অপরাধ। আর সেই অজ্ঞানতার কারণেই সারা পৃথিবীতে মুসলমানদের এত অবনতি। গোফরানের কথা শুনে আর কেউ মাইকের কথা তুলল না।

ঐদিন রাতে তাহমীনা এক ফাঁকে সুফিয়াকে বলল, ফুপু, তুমি এবারে আফিরকে সাথে নিয়ে যেও। এখানে আর পাঠিও না। তুমিই মানুষ করো।

সুফিয়া অন্য ভাইপো ভাইজীর চেয়ে তাহমীনাকে একটু বেশি ভালবাসে। কারণ অন্যদের চেয়ে সে খুব ধীর ও নম্র। নিয়মিত নামায রোযা করে। ক্বুরআন পড়ে। সেজন্যে বোধ হয় সাদিয়া ভাবিকেও তাকে ভালবাসতে দেখেছে। তার কথা শুনে সুফিয়া বেশ অবাক হল। জিজ্ঞেস করল, হঠাৎ তুই একথা বলছিস কেন? আরিফ কি তোদের উপর খুব বড় বোঝা হয়ে গেছে?

তাহমীনা ছল ছল চোখে বলল, না ফুপু তা নয়। অন্য কারণ আছে। তোমাদের জামাই দু'একদিনের মধ্যে আমাকে নিয়ে চলে যাবে। তুমি যদি নিতে না চাও তা হলে আমি নিয়ে যাব।

সুফিয়া আরও অবাক হয়ে বলল, তোর কথা শুনে মনে হচ্ছে, এর ভিতর কিছু রহস্য আছে। কি ব্যাপার বলতো?

তাহমিনা চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে বলল, মাফ কর ফুপু, বলতে পারব না। তবে এ টুকু বলতে পারি, এখানে থাকলে আরিফের ক্ষতি হতে পারে।

সুফিয়া বড় ভাবিকে চিনে। তার উপর তাহমীনার কথা শুনে ও তার চোখে পানি দেখে বুঝতে পারল, এমন কোনো ঘটনা নিশ্চয় ঘটেছে, যার জন্যে আরিফকে নিয়ে

যেতে বলছে। বলল, তুই না বললেও যা বোঝার আমি বুঝে গেছি। আমিতো আরিফকে নিয়ে যেতেই চাই; কিন্তু যদি তোর বাপ দিতে না চায়?

তাহমীনা চোখ মুছতে মুছতে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, তারা না চাইলেও তুমি জোর করে নিয়ে যাবে। আর আমি যে তোমাকে এই কথা বললাম, তা আব্বা আম্মাকে বলো না।

সুফিয়া বলল, ঠিক আছে, তুই চিন্তা করিস না। আমি আরিফকে এবারে নিয়ে যাবই।

পরের দিন এক সময় সকলের সমানে সুফিয়া খলিলকে বলল, আমি এবারে আরিফকে নিয়ে যাব। আমার কোনো ছেলে মেয়ে নেই। আমি ওকে মানুষ করব।

নিহারবানু ভাতে বিষ দেয়ার পর থেকে খলিল ভেবেছে, সুফিয়া বুবুর কাছে আরিফকে দিয়ে দিবে। এখন তার কথা শুন বলল, আমার কোনো আপত্তি নেই। তোমার ভাবি কি বলে দেখ।

সুফিয়া বলল, ভাবি নিজের ছেলেমেয়ে দেখছে, সংসার দেখছে। তার উপর আরিফকে দেখছে। তাতে তার বেশ কষ্ট হচ্ছে। আমি আরিফকে নিয়ে গেলে তার কাজ একটু হালকা হবে। তারপর নিহারবানুর দিকে তাকিয়ে বলল, আমি আরিফকে নিয়ে গেলে, তুমি কি অসন্তুষ্ট হবে ভাবি?

নিহারবানু ঐসব ঘটনার পর আরিফকে বড় ননদের কাছে দিয়ে দেবে ভেবে রেখেছিল। বলল, এতে অসন্তুষ্ট হওয়ার কি আছে? সংসারের কাজের জন্য আমি আরিফের ঠিকমতো যত্ন নিতে পারি না। তোমার কাছে থাকলে তুমি ভালোভাবে যত্ন করে ওকে মানুষ করতে পারবে। তা ছাড়া তাহমীনার আব্বা যখন চাচ্ছে তখন আমি অমত করব কেন?

সুফিয়া আলহামদুলিল্লাহ বলে বলল, কাল আমরা ওকে নিয়ে চলে যাব। তারপর আরিফকে কোলে নিয়ে চুমো খেয়ে বলল, কিরে আব্বু, তুই আমার কাছে থাকবি তো?

আরিফের বয়স এখন সাড়ে তিন বছর। কিন্তু বয়সের তুলনায় সে যেমন চালাক তেমনি এখন অনেক কথা বলে, যা শুনে সবাই অবাক হয়ে যায়। ফুপুর কথা শুনে তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, হ্যাঁ ফুপু, আমি তোমার কাছে থাকব। তারপর খলিলের দিকে তাকিয়ে বলল, চাচা, আপনি আমাকে দেখতে যাবেন তো?

খলিল সুফিয়ার কোল থেকে আরিফকে নিয়ে চুমো খেয়ে ভিজে গলায় বলল, হ্যাঁ বাবা যাব।

এবার আরিফ তাহমীনার দিকে তাকিয়ে বলল, বড় আপা, তুমি দুলাভাইকে সাথে নিয়ে আমাকে দেখতে যাবে।

তাহমীনা ছোট চাচিকে যেমন শ্রদ্ধা করত তেমনি আরিফকেও খুব স্নেহ করে। তাই ছোট চাচি মারা যাওয়ার পর মায়ের কুমতলবের কথা জানতে পেরে আরিফকে যক্ষের ধনের মতো আগলে রেখেছে। ফুপু আরিফকে নিয়ে চলে যাবে শুনে একদিকে যেমন খুব খুশি হল, অপরদিকে তাকে কবে আবার দেখতে পাবে না পাবে ভেবে দুঃখও হচ্ছে। আরিফের কথা শুনে বলল, যাব না আবার, নিশ্চয় যাব।

পরের দিন সকালে সুফিয়া আরিফকে নিয়ে স্বামীর সঙ্গে সমেশপুরে ফিরে এল।